সোনার চেয়ে দামী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৮

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

লেখকের কথা

পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মত তিনটি খণ্ডে সোনার চেয়ে দাম কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যায় না।

প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বড় হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাক নাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপোষ'।

লেখকের কথা

পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মত তিনটি খণ্ডে সোনার চেয়ে দামী কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যায় না।

প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বড় হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাক নাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপোষ'।

আপোষ

১

সোনা ওজনে খুব ভারি।

সোনা নামক ধাতুর এই বিশেষ গুণের খবর কলেজে পড়বার সময়েই রাখাল জেনেছিল। জেনেছিল বই পড়ে। সোনার চেয়ে ভারি সোনার চেয়ে দামী ধাতু আছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। যেমন এটম বোমা তৈরীর ধাতু আবিষ্কার করতে হয়েছে বিজ্ঞানকেই এগিয়ে গিয়ে। বিজ্ঞান শুধু নতুন খোঁজে—নতুন পথ, নতুন বিকাশ, বস্তু ও জীবনের নতুন দাম।

দামের হিসাবে সোনাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান।

কিন্তু তবু সোনার চেয়ে দামী হতে পারে নি, সেই ধাতু যে ধাতু দিয়ে মানুষ আজকাল এটম বোমা বানায়।

এখনও সোনাই মানুষের সবচেয়ে জানাচেনা আপন পদার্থ, সোনাকেই মানুষ আরও বেশী বেশী আপন করতে চায়, সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে ব্যাকুল হয়ে থাকে চিন্তাভাবনা আশা আকাঙ্খা।

সোনার রঙেই সব চেয়ে রঙীন হয় জীবন।

কি ওজনে আর কি দামে সোনার সাথে পাল্লা দিতে পারে যে অসাধারণ ধাতু সে ধাতুর সঙ্গে পরিচয় নেই সাধারণ মানুষের।

প্রয়োজনও নেই। সোনাই মানুষের আদরের সোনামানিক।

জানা কথাটা রাখালের অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়েছিল সেদিন, বিশুকে পড়াতে গিয়ে ঘর খালি পেয়ে বিশুর মার একরাশি গয়নার সামান্য একটা অংশ যেদিন না বলে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। গয়না কটার ওজন তাকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিল।

রাখাল জেনেছে, সোনার আরেকটা ওজন আছে।

অন্যরকম ওজন।

অবস্থার ফেরে সোনা যখন চাপ দেবার সুযোগ পায় মানুষের বিবেকে, তখন বিবেকে চাপানো সেই সোনার চেয়ে ভারি আর কিছুই থাকে না এ জগতে।

ফাঁক পেলেই সোনা বিবেকে চেপে বসে।

যুক্তি অযুক্তি কিছুই খাটে না, মনের জোরে তুচ্ছ করা যায় না, বেপরোয়া বেশ কবেছি মনোভাব দিয়ে দেওয়া যায় না উড়িয়ে।

না বলে একজনের গয়না ধার হিসাবে নিলেও বিবেককে সে গয়না কামড়াবেই কামড়াবে। চোর হয়ে চুরি করলেই বরং এত বেশী কামড়ায় না। চোর ছ্যাঁচোরের কাছে সোনার চেয়ে দামী কিছুই নেই!

বড় বড় রাজা মন্ত্রী চোরের বিবেকে একেবারেই কামড়ায়

না। প্রত্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে কামড়ায় না। বিশেষভাবে চুরি করার বিশেষত্বকে দেশসেবায় নীতি হিসাবে প্রচার করার প্রচণ্ড নেশায় মশগুল হয়ে থাকে।

জেনে বুঝে চোর হলে তো ফুরিয়েই গেল বিবেকের বালাই, বিবেক বিসর্জ্জন দিয়ে চুরি করলাম। চোর আমি হব না কিছুতেই—এ সংস্কারকেও খাতির করব, আবার চোর যা করে ঠিক সেই কাজটাই করব কতগুলি যুক্তি খাড়া করে, এতে কি আর রেহাই মেলে।

নিজেকে রাখাল চোর ভাবে। তবু বিবেক কামড়ায়।

কারণ নিজের কাছে সে অস্বীকার করে না যে নিজের হিসাব তার যাই হোক, দশজনের হিসাবে সে চোর ছাড়া কিছুই নয়!

দশজনের হিসাবে চোর হলেও নিজের হিসাবে চোর নয়! এ কি নীতি ভাঙ্গবার জন্য নৈতিক সমর্থন সৃষ্টির সেই চির পুরাতন ধাপ্পাবাজি নয়? বড় বড় অনেক নীতিজ্ঞ মহাপুরুষ যে নৈতিক ধাপ্পাবাজির জোরে মানুষের সুখ সম্পদ স্বাধীনতা চুরি করে? ধরতে গেলে আসলে যাদের কল্যাণে রাখালকে নিরুপায় হয়ে উদ্বাস্তু এক জমিদারের বৌয়ের সেকেলে ধরণের শ্রদ্ধা মেশানো স্নেহে তাকে আপন কথায় সুযোগ নিয়ে তারই অনেক গয়নার ক্ষুদ্র অংশ গয়না কটা না বলে নিতে হয়েছে?

এসব জানে রাখাল।

এসব প্যাঁচ কষে, এসব ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ভোলাতে

পারলে তো কথাই ছিল না। তার কাজ করার এবং উপার্জ্জনের অধিকার অন্যে চুরি করেছে বলেই তার চুরিটা চুরি নয়, এটা শুধু হাস্যকর অজুহাত কেন, নৈতিক যুক্তিই নয় রাখালের কাছে। যে স্বার্থ চুরি-চামারিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়েছে শতগুণ সেটাই যে আবার সংগ্রামের পথে সাধারণ মানুষের বীর মানুষ হওয়ার রেট লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ দিকটা ভুললে চলবে কেন তার ?

ছাঁটাই হয়ে বেকার হয়ে বছর দেড়েক সেও কি অংশ নেয় নি এই বাঁচার সংগ্রামে ?

অন্যায়কে নিজের অন্যায়ের কৈফিয়ৎ দাঁড় করাবার ফাঁকি রাখাল জানে।

কোন নৈতিক সমর্থনই সে সৃষ্টি করে নি নিজের কাজের। সমস্ত কাহিনী শুনে কেউ যদি তাকে চোর বলে, সে প্রতিবাদ করতে যাবে না। এইটাই তার দশজনের হিসাবে নিজেকে চোর মনে করার মানে।

তার নিজের হিসাবের মানেটা খুব সোজা। বিশুর মা'র গয়না সে চুরি করে নি, শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে নিয়েছে। ঋণ হিসাবে নিয়েছে।

প্রচুর গয়না আছে বিশুর মার। একেবারে অকেজো অনাবশ্যক মাটির ঢেলার মতই রাশিকৃত সোনা তোরঙ্গে পড়ে আছে। এই সামান্য ক'খানা গয়নার অভাব টেরও পাবে না বিশুর মা।

না জানিয়ে চুপি চুপি নিয়েছে। কিন্তু আর কি উপায়

ছিল? বলে কয়ে নিতে চাইলে এ জগতে কে তাকে দিচ্ছে ঋণ? কে স্বীকার করছে যে বেকার নিরুপায় তারও যোগ্যতা আছে দাবী আছে ঋণ পাবার?

সরকারের পর্য্যন্ত ঋণ দরকার হয়, সকলের ধন কেড়ে নিয়ে যে কজন হয়েছে কুবেরের মত ধনী, তাদের বসম্বদ যে সরকার। সরকার কোটি টাকা ঋণ চাইলে কয়েক ঘণ্টায় সে টাকা উঠে উঠে যায়। ঋণ দিতে উৎসুক অনেকের টাকা বাতিল করতে হয়।

তাকে কে ঋণ দিচ্ছে পাঁচটা টাকা?

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রাশি রাশি সোনা অকেজো করে যদি ফেলে রাখতে পারে মানুষ, সেও তার চরম প্রয়োজনের সময় না বলে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ধার নিতে পারে।

সাধনা যখন ভেঙ্গে পড়েছে, সেই সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার উপক্রম করেছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন, আর কোন উপায় না থাকলে এ ভাবে ঋণ গ্রহণের অধিকার তার নিশ্চয় জন্মায়।

সাধারণ সুখের লোভে, সাধারণ অভাব অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে সে বিশুর মার গয়নাগুলি নেয় নি। এদিক দিয়ে সে খাঁটি থেকেছে নিজের কাছে। গয়না ক'টা বেচে দু'হাজারেরও বেশী টাকা পকেটে নিয়ে খিদেয় যখন ঝিম ঝিম করছিল জগৎ তখনও সে প্রশ্রয় দেয় নি একটি চপ খাবার ইচ্ছাকে। ওই দু'হাজার টাকা নয়, পকেটে হাত দিয়ে হিসাব করেছিল নিজের এগারো আনা পয়সার!

সাধনাই ছিল তার সবার সেরা যুক্তি।

আকস্মিক বেকারির অসহ্য চাপে সাধনার সাময়িক উন্মত্ততা সামলাতে হবেই, যে ভাবে হোক ঠেকাতে হবেই তার নিজেকে ধ্বংস করার সঙ্গে স্বামীপুত্র সংসারটাও ধ্বংস করে দেওয়া। বিশুর মার গয়না নেওয়া উচিত কি অনুচিত সে বিবেচনার সুযোগ পাবে অনেক, সাধনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে সারা জীবনটাই তাদের যাবে ভেস্তে।

শেষপর্য্যন্ত কিন্তু তার এই হিসাবটাই সাধনা দিয়েছে ভেস্তে।

সাধনা একরকম তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অতটা বিগড়ে সে যায় নি, এত বেশী অসহ্য তার হয় নি স্বামীর বেকারত্বের দুর্দশা যে আত্মহারা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভেঙ্গে পড়বে। তার জন্য বিশুর মার গয়ণা নেবার কোনই দরকার ছিল না রাখালের!

শুধু তাই নয়।

যেদিক দিয়ে যেভাবে তার উচিত ছিল অবস্থাটা সহনীয় করতে সাধনাকে সাহায্য করা, সেদিক দিয়ে সেভাবে কোন সাহায্যই সে করে নি তাকে। তাকে নরম জেনে দুর্ব্বল জেনে তেমনি রেখে দিতে চেয়েছে। চরম দুর্দ্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এতটুকু ভাগাভাগি করতে চায় নি বাঁচার ও বাঁচাবার দায়িত্ব, স্বামীত্বের অহঙ্কারে আগের মতই সাধনাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে জীবন-সংগ্রামের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে।

একাই সে দিবারাত্রি ভেবেছে কিসে কি হবে আর কিভাবে কি করা যাবে, অথচ বিশেষ কিছু করতে না পেরেও দাবী ঠিক খাড়া রেখেছে যে যতটুকু সে করতে পারে তাই মানতে হবে সাধনাকে, অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে শান্তভাবে সমস্ত নতুন দুঃখ কষ্ট সয়ে যেতে হবে।

সে-ই একমাত্র রক্ষাকর্তা সাধনার। তাকে রক্ষা করার জন্য যে অমানুষিক চেষ্টা আর পরিশ্রম সে করে চলেছে তাতেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সাধনার।

আর কিছুই তার করার দরকার নেই। কৃতজ্ঞ থাকবে আর নীরবে অবিচলিত ভাবে সব সয়ে যাবে। তার না জানলেও চলবে সমস্যাটা কি এবং তার ভারটা লাঘব করতে কিছু না করলেও চলবে।

সাধনারও যে প্রয়োজন আছে নতুন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা, এটা সে খেয়ালও করে নি!

এই ঘরের কোণে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করতে করতে আশেপাশের জীবনের বাস্তবতা থেকে সাধনা নিজেই ধরতে পেরেছে এবার তারও একটু বদলান দরকার, শুধু আগের দিনের শোকে কাতর হয়ে থাকলে চলবে না। নিজের প্রয়োজনে নিজের তাগিদেই সাধনা হতাশাকে ঠেকিয়েছে, খানিকটা বদলে দিয়েছে নিজেকে।

সে তাই কৃতজ্ঞতা পায় নি সাধনার। তাকে শুধু ক্ষমা করে মেনে নিয়েছে।

বিশুর মার গয়না বেচা টাকা রোজগারের উপায়ে লাগিয়ে

ক্রমে ক্রমে অবস্থার খানিকটা উন্নতি করেও সে সাধনার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারছে না। সে তাকে শেখায় নি মিলে মিশে চরম দুর্গতিকে গ্রহণ করার প্রয়োজন, তাদের সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সচেতন ভাবে জবরদস্ত শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তার পাশে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন।

অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধনাকে এটা বুঝতে হয়েছিল—একা একা।

সে শুধু আপোষ করেছিল। রাখালের সঙ্গে নয়, বাস্তবতার সঙ্গে।

রাখাল কি ভাবে প্রাণপাত করে নিজের বিবেককে পর্য্যন্ত বাঁধা রেখে সর্ব্বনাশের মোড় ঘুরিয়েছে, দুরবস্থাকে আয়ত্ত করেছে, সেজন্য মাথাব্যথা নেই সাধনার।

কর্তব্য করছে রাখাল। যা সে নিজেই করতে চায়, একলা করতে চায়, যা করে সে স্বামী হয়ে থাকতে চায় সাধনার, সেটুকু শুধু করছে রাখাল!

আগে আপিসে চাকরি করে করত। এখন অন্যভাবে সেই কাজ করছে।

তার বিবেক বাঁধা রাখার আসল ব্যাপারটা অবশ্য সাধনা জানে না। তাকে সে জানায় নি। বিশুর মার গয়নার কথা খুলে জানিয়ে অনর্থক তার মনের শান্তি নষ্ট করার কোন মানেই রাখাল খুঁজে পায় না।

হঠাৎ এতগুলি টাকা সে কোথায় পেল তার কৈফিয়ৎ

হিসাবে জানিয়েছে যে হীনতা স্বীকার করে চেনা একজন ধনীর কাছে টাকাটা সে ঋণ নিয়েছে, শোধ দিতে না পারলে দায়ে ঠেকবে।

নিজের কাছে দায়ে ঠেকবে, নিজের বিবেকের কাছে!

ঃ দেখো, যেন বিপদে প'ড়ো না!

আজও রাত নটা দশটায় ফিরতে হয়। তবে বাসেই ফিরতে পারে। পূরো প্যাকেট সিগারেট পকেটে নিয়ে।

খাওয়ার আগে বিশ্রামের ছলেও একটা সিগারেট টানা যায়। বিয়েতে পাওয়া খাটের বিছানায় পা তুলে বসে সিগারেটে টান দিয়ে হাসবার চেষ্টা করে রাখাল বলে, উঃ, কী ভীষণ দিনগুলিই গেল!

সাধনা যন্ত্রের মত সায় দিয়ে বলে, সত্যি।

ঃ তুমি পেট ভরে ভাত পেতে না, একফোঁটা দুধ পর্য্যন্ত পেতে না!

ঃ সত্যি। দুধ খেতে আমার ঘেন্না করে।

ঃ খোকনকে তিনপোয়া দুধ খাওয়াও তো?

ঃ কি করে খাওয়াবো? পেট ছেড়েছে যে। আজ সারাদিন শুধু বার্লি খাইয়েছি।

এমন কিছু বড়লোক হয়ে যায় নি রাখাল। একটু সামলে উঠতে পেরেই দু'একটা দিকে বাড়াবাড়ি করার তার ঝোঁক চেপেছে। ছেলেটা মোটে একপোয়া দুধ খেত আর টেনে টেনে টনটনিয়ে দিত সাধনায় মাই, তাই সে একজন বাঙালী

গোয়ালিনী আর একজন পশ্চিমা গোয়ালার কাছে দুধ রোজ করেছে দু'সের।

নামেই অবশ্য দু'সের দুধ। খাঁটি দুধের জলীয় সংস্করণ। মানবী মা হোক আর গোমাতাই হোক কারো দুধ জমাট বস্তু নয়। খাঁটি দুধও জলের দ্বারাই তরল হয়ে থাকে। কিন্তু রাখাল যে দু'সের দুধ রোজ করেছে তার মধ্যে সেরখানেক বাড়তি জল।

কল আর পুকুরের জল।

শুধুই কি কলের জল আর পুকুরের জল?

দেশসেবা ত্যাগ আর গণতন্ত্রের নামে সর্ব্বাঙ্গীন চোরামির যুগে দুধ-বেচুনেরাও কি আয়ত্ত করবে না সামনে দাঁড়িয়ে গরুর বাঁট থেকে জলহীন বালতীতে দুধ ঝরে পড়াটা শ্যেন দৃষ্টিতে দেখে যে দুধ কিনবে তাকেও ঠকাতে?

গোমাতার মুখের খাদ্য কন্ট্রোল করে বাঁট থেকে ঝরা খাঁটি দুধকে কলের বা পুকুরের (কখনো নর্দ্দমার) জল মেশানো দুধের মতই পরিমাণে বাড়িয়ে তরল করার কৌশল তারা জানে।

রাখাল তাই বলে, কেন মিছে মাথা গরম করছ? এক টাকা সের চাল যে হিসাবে কিনি, জল মেশানো দুধও কিনি সেই হিসাবে। চোরাবাজারী চালের দাম দুধের দাম অনুপাতে ঠিক আছে।

মানেটা এই যে চাল আছে কন্ট্রোলে তাই তার চোরাবাজার। দুধ কন্ট্রোলে নেই তাই তাতে ভাঁওতা।

ভগীরথের গঙ্গা আনার মত সে যেন দুধের বন্যা এনে দেবে না খেয়ে শুকিয়ে আমসি বনা তার বৌ আর ছেলের পেটে।

রাখাল চিন্তিত হয়ে বলে, খোকনের দুধ হজম হয় না? তোমার দুধ খেতে ঘেন্না হয়? কে জানে বাবা এসব কি ব্যাপার!

খেতে বসে আশা করে, সাধনা মাছের কথা তুলবে। নিজে থেকে ভাল মাছ এনেছে, বেশী করে এনেছে—দু'জন মানুষের জন্য তিনপোয়া মাছ! কিন্তু সাধনা সাধারণ কথাই বলে, মাছ সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করে না।

ঃ একদিন মাছের কড়াই উনানে উল্টে দিয়েছিলে, মনে আছে?

ঃ মনে থাকবে না? ভাপ লেগে সারাদিন মুখটা জ্বালা করেছিল। যেমন বোকার মত রেগেছিলাম, তার শাস্তি।

সাধনা হাসে, সহজ শান্তভাবে। জিজ্ঞাসাও করে মাছটা রান্না কেমন হয়েছে, আরেক টুকরো খাবে নাকি রাখাল। কিন্তু মাছ ভালবাসে বলে তার জন্য বেশী করে মাছ আনায় সে বিশেষভাবে খুসী হয়েছে কি না টেরও পাওয়া যায় না।

একটু আনমনা উদাসীন ভাব সাধনার। বছরখানেক দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তেও তার যে প্রাণশক্তি, ছোট সংসারটি নিয়ে মেতে থাকার যে আবেগ উদ্দীপনা বজায় ছিল, একটু স্বচ্ছলতা ফিরে আসতেই যেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে।

তার আনন্দ ছিল যেমন উচ্ছল, রাগ অভিমানও ছিল তেমনি প্রচণ্ড।

খুসীর কারণ ঘটলে আগের মত ডগমগ হয়ে না উঠুক, তেজের সঙ্গে একবার যদি সে রাগও করত!

কোমর বেঁধে প্রাণ খুলে একবার ঝগড়া করত রাখালের সঙ্গে!

সম্পর্ক তাদের বজায় আছে আগের মতই, আগের মতই তার বৌ হয়ে আছে সাধনা, মা হয়ে আছে তার ছেলের, সংসার করছে—কিন্তু কেমন একটু শান্ত সংযতভাবে, একটু আবেগহীনভাবে।

আগের মত সাধনা আর নেই।

আজকাল সে খুব পাড়া বেড়ায়।

উদ্বাস্তু কলোনিটাতে রোজই একবার ঘুরে আসে। সাধনার কাছ থেকেই রাখাল শুনতে পায় এই সঙ্কীর্ণ এলাকার বাইরের জগতটুকুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার নানা বিবরণ.

রাখালের মনে হয়, সাধনা কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে পাড়ার ঘরে ঘরে আর উদ্বাস্তুদের ওই ছোট বসতিটুকুতে।

আগেও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর রাখত আশে পাশের ঘরে ঘরে কি ঘটছে না ঘটছে। তিন চারটি বাড়ীর সাত আটটি পরিবারের জীবনযাত্রা তার প্রায় নখদর্পণে ছিল, কার ঘরে কি রান্না হয়েছে আর কার একটু সর্দ্দি হয়েছে সে খবর থেকে কার দূর দেশের আত্মীয়স্বজন কি বিষয়ে চিঠি লিখেছে সে খবর পর্য্যন্ত। কেবল সাধনা বলে নয়,

সব বাড়ীর মেয়েরাই এরকম খবরাখবর রেখে থাকে। সহরতলী পাড়ায় এটা আজও বজায় আছে, মেয়েদের মৌখিক গেজেটে প্রত্যেক পরিবারের খবরাখবর অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের জানাজানি হয়।

সাধনা হয় তো ন'মাসে ছ'মাসে কদাচিৎ পাঁচদশ মিনিটের জন্য যায় মল্লিকদের বাড়ী, কিন্তু বীরেন দত্তের বৌটির সঙ্গে তার খুব ভাব।

তার নাম প্রতিভা।

প্রতিভার আবার গলায় গলায় ভাব মল্লিকদের বাড়ীর শোভার সঙ্গে।

প্রতিভার কাছে সাধনা হাঁড়ির খবর পায় মল্লিকদের, তারই মারফতে আবার সাধনার হাঁড়ির খবর পৌঁছে যায় মল্লিকদের বাড়ী। যা শোনে এবং যা জানে সাধনা আবার তা শোনায় আরও দু'একজনকে যাদের সঙ্গে তার ভাব আছে। তাদের কাছে খবর শোনে অন্য বাড়ির।

তারা আবার শোনায় অন্যদের।

এমনিভাবে জানাজানি হয়।

একজনকে যে পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে হয় তা নয়, সব বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় তাও নয়। দু'চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। পাড়ার কোন বাড়ীর মানুষের চালচলন স্বভাবচরিত্র, সংসারের অবস্থা আর গতি প্রকৃতি কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

কিন্তু সে ছিল আলাদা ব্যাপার। সে ছিল শুধু তথ্য জেনে কৌতূহল মেটানো। আজকাল সাধনার শুধু খবর শুনে সাধ মেটে না, নিজে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে আসে মানুষগুলির সঙ্গে। যে বাড়ীতে তার ছিল ন'মাসে ছ'মাসে একদিন বেড়াতে যাওয়া, নিতান্তই নিয়ম রক্ষার জন্য, সে বাড়ীতে আজকাল সে ঘন ঘন যাতায়াত করে। যাদের সে পছন্দ করত না, যাদের সঙ্গ ছিল বিরক্তিকর, যেচে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করে।

ছোট বড় নীড়গুলিতে ছড়ানো জীবনে সে যেন সন্ধান করছে গভীরতর কোন তাৎপর্য্য, নতুন কোন মানে বুঝবার চেষ্টা করছে চেনা মানুষগুলির জানা জীবনের।

জানা জীবন ভেঙ্গে পড়ছে, গতি নিয়েছে অজানা অনিবার্য্য পরিণতির দিকে। তা, জীবন তো আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংস হচ্ছে অবস্থাটা। ধ্বংসের পথে কোন নতুন অবস্থায় জীবন আবার নতুন রূপ নিতে চলেছে জানবার বুঝবার জন্য কৌতূহলের সীমা নেই সাধনার।

তারও কিনা সেই একই পথে গতি!

রাখালের কাছে আজকাল শুধু সে পাড়ার গল্পই করে না, অনেক জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে যায় তার বর্ণনায়। রাখালকেই সে প্রশ্ন করে তা নয়। তার নিজের মনেই জেগেছে প্রশ্নগুলি এবং সর্ব্বত্রই সে খুঁজছে জবাব, সেগুলির যেটুকু ক্ষেত্র তার অধিগম্য, যে ক'জন মানুষ তার জানা চেনা। শকুন্তলাকে যে দেখতে এসেছিল আধবুড়ো বিপত্নীক এক ব্যবসায়ী সে গল্প

শোনানোর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার এই জিজ্ঞাসা তুলে ধরা যে বিয়ে ছাড়া গতি নেই মেয়েটার, আর কোন যোগ্যতার ব্যবস্থা করা হয় নি, তবু মেয়েটার বিয়ে দিতে এত উদাসীন কেন ওর বাপ ভাই? এমন খারাপ অবস্থা তো নয় যে বিয়ে দিতে পারছে না? মানুষও তো ওরা খারাপ নয়, বজ্জাত নয়? মেয়েরও তো এমন কোন খুঁত নেই, বাপ ভাই যাকে ঠিক করুক তাকেই বিয়ে করতেও সে রাজী? এমন ভাবে বয়স বেড়ে চলেছে, আগে হলে বাড়ীর লোক কবে পাগল হয়ে উঠত মেয়েটাকে পার করার জন্য, আজ কোথা থেকে কি ভাবে এই অদ্ভুত গা-ছাড়া নিশ্চেষ্ট ভাব এল? এর আসল মানেটা কি?

এটা বিশেষ ভাবে শকুন্তলা সম্পর্কে প্রশ্ন। অবিকল না হলেও মোটামুটি একই রকম প্রশ্ন জাগে লতিকা আর অমিয়ার সম্পর্কে।

বিয়ে তাদের হচ্ছে না কেন?

কয়েক বছর আগে এরকম পরিবারের এই বয়সের এরকম মেয়েদের কুমারী দেখা যেত না। স্কুল কলেজে পড়ে, টাইপ রাইটিং শেখে, ভুখা মানুষদের ওপর গুলি চললে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দেয়, সেরকম মেয়ে এরা নয়।

আগের মতই ঘরে ক, খ শেখা সেলাই শেখা রান্না শেখা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরী করা সব মেয়ে।

নীচের ভাড়াটের সঙ্গে দত্তদের যে আরেকবার মারামারি বাধবার উপক্রম হয়েছিল তাতে সাধনা আশ্চর্য্য হয় নি।

সে ভেবে পায় না দুটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও কি করে নামল এই ঝগড়ায়, গলা চড়িয়ে কুৎসিৎ ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিল ? সে তো নিজে গিয়ে দেখে এসেছে যে এ দুটি বাড়ীর মেয়েরা ছোটলোক হয়ে যায় নি, তবু ?

নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী নিজে শিক্ষিতা, লেখাপড়ায় নাচে:গানে তার মেয়ে দুটি এ পাড়ায় অতুলনীয়া, ভাড়াটে সুধীর মুখার্জির স্ত্রীর এমন মিশুক স্বভাব, তার ছেলের বৌ অঞ্জলি এমন লাজুক প্রকৃতির, তার মেয়ে নমিতার এমন সরল হাসি মিষ্টি কথা—তবু ?

সেনদের নতুন রাঁধুনিটাও আবার পালিয়ে গেছে জানিয়ে সাধনা আ:গের মত বিনয় সেনের বৌ সুহাসিনীর মন্দ স্বভাবের কথা বলে ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে দেয় না, ওদের বাড়ী ঝি রাঁধুনি টেঁকে না কেন এ রহস্যকে নতুন করে তুলে ধরে মাথা ঘামায়।

সুহাসিনীর স্বভাবের জন্য হতেই পারে না, অন্য কারণ আছে।

বারোমাস রোগে ভুগে সত্যি ভারি খিট খিটে স্বভাব হয়েছিল, কিন্তু পর পর দু'টি ছেলে মরে গিয়ে সে তো শোকে কাবু হয়ে বিছানা নিয়েছে, ভালো-মন্দ কোন কথাই কাউকে বলে না ? চাকর ঠাকুর ঝি রাঁধুনির উপর বরাবর সে সংসারের সব ভার ছেড়ে দেয়, আগে তবু দেখা শোনা করত তারা.কি করছে না করছে, আজকাল তো জিজ্ঞাসাও করে না ?

রাঁধুনিটার হাতেই সে তো সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল, সে যা করে তাই সই, তবু কেন তিনদিন কাজ করেই এ লোকটাও পালিয়ে গেল ?

কেন বার বার এ ব্যাপার ঘটবে, কারণ কি ?

ঘোষালদের বাড়ীতে লোক বেশী, খাটুনি বেশী, মাইনে কম ; ঘোষাল-গিন্নির যেমন ছুঁচিবাই তেমনি চব্বিশ ঘণ্টা খেঁচাখেঁচি বলে ওদের কাজ ছেড়ে এসেছিল রাঁধুনিটা এ বাড়ীতে। এখানে ছোট সংসারে বেশী বেতনে নিজের খুশীমত নির্ব্বিবাদে কাজ করার সুযোগ পেয়েও আবার কেন ফিরে গেল ঘোষালদের বাড়ীতে ?

আশী টাকা উপার্জনে একখানা ঘরে পরেশের সংসার, তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, এক ফোঁটা দুধ রাখে না। দুধ ছাড়া যদি না চলে ছেলেপিলের, ওরা বেঁচে আছে কি করে ? খেলাধুলো করার জোর কোথায় পায় ? আবার যে ছেলেপিলে হবে পরেশের বৌ অমলার, সেজন্য ওদের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই কেন ?

ওরা অবশ্য বলে যে মরতে বসেছি। কিন্তু মুখে বললেই তো হয় না। দুশ্চিন্তায় ওরা পাগল হয়ে গেল কই ?

কাছেই ওই উদ্বাস্তু কলোনি, ওদের একই দেশ থেকে যারা এসে বাড়ী কিনেছে এখানে, তারা কেন ভুলেও দেশের লোকের কলোনিতে পা দেয় না ? রাখালের ছাত্র বিশুর বাড়ীর লোকেরা কেন এড়িয়ে চলে কলোনির হোগলার ঘরের বাসিন্দা দেশের লোককে ?

এমনি কতভাবের কত যে জিজ্ঞাসা সাধনার।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাখাল। সাধনাকে তার মনে হয় আনমনা উদাসীন—তাকেও যে সাধনার অবিকল সেইরকম মনে হয় এটা এখনো খেয়াল হয় নি রাখালের।

ঃ দিনরাত অত কি ভাব?

ঃ দিনরাত ভাবি? দিন তো কাটে বাইরে, রাত নটা পর্য্যন্ত।

ঃ তুমি দিনরাত ভাব। ঘরেও ভাব, বাইরেও ভাব।

ঃ দিনরাত ভাবি জানলে কি করে?

ঃ ও বোঝা যায়।

ঃ কি করে?

এসব তার আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার কৌশল। সাধনা কিন্তু রাগ করে না।

বলে, বাড়ীতে যতক্ষণ থাকো, আগেও থাকতে, এখনো থাকো। আগে এরকম ভাবতে না। একদিন দুদিন নয়, রোজ ভাবতে দেখছি। শুধু বাড়ীতে একটু ভেবে এরকম চিন্তা কেউ তাকে তুলে রাখতে পারে? আমার কাছে লুকিও না। কিছু হয়ে থাকলে আমায় না বলে লাভ নেই জান তো?

বলতে বলতে সাধনা আরও কাছে সরে এসে বসে। গরমে ঘামাছিতে ছেয়ে গেছে রাখালের গা, আদর করে ঘামাছি মেরে দেয়।

কয়েক মুহূর্ত কেমন বিকল হয়ে যায় রাখাল।

: বিশেষ কিছু ভাবছি না। কি করব না করব এই নানা চিন্তা।

বলে রাখাল তাকে বুকে টেনে নেয়।

: দোকান ভাল চলছে না?

: দোকান ঠিক চলছে। রাজীব পাকা লোক।

: তবে? ধারের টাকার কথা ভাবছ? কত বলছি খরচ বাড়িও না—

রাখাল শুনতে পায় না তার কথা!

সে তখন ভাবছে, সব কথা খুলে বলবে কি সাধনাকে? খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে বলবে সে কি করেছে এবং কেন সে তা করেছে?

কিন্তু সাধনা কি বুঝবে তার কথা? বিশুর মার গয়না লুকিয়ে নিয়েও কেন সে চোর হয়ে যায় নি, তার মানেও বুঝবে? রাখাল নিজেই মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দেয়—না, সাধনা বুঝবে না। তার কাছে এটা আশা করাই অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা!

সাধনাও সেই দশজনের একজন তার কাজকে যারা চুরিই বলবে এবং তাকে ভাববে চোর।

চুরি সে করেছে একা। তাই নিজের বৌয়ের কাছেও চোর হয়ে গেছে। চোরেরও বৌ থাকে, স্বামীকে চোর হিসাবেই সে নেয়। সাধনা চোরের বৌ হিসাবে তাকে চোর বলে নেবে না, দশজনের একজন হয়ে তাকে চোর ভাববে।

শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে আসে রাখালের অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ। সেটা টের পেয়েই মুখ ম্লান হয়ে যায় সাধনার, তার বুক থেকে মুক্তি নিয়ে তফাতে সরে বসে হাই তুলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে।

এই ভাবনার মানেই সে জানতে চেয়েছিল রাখালের কাছে, সে ভাবনা আদরের আলিঙ্গনকেও এভাবে শিথিল করে দিতে পারে, আজ পর্য্যন্ত কখনো যা ঘটে নি!

দুশ্চিন্তায় ডুবে থেকে রাখাল তাকে আদর করে নি, তার দিকে ফিরে তাকায় নি—সে ছিল ভিন্ন কথা। তাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে রাখাল অন্যমনস্ক হয়ে ঝিমিয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন, একেবারেই দুর্ব্বোধ্য।

২

রাজীবের সঙ্গে বিড়ির পাতা সুখার তামাক আর সিগারেটের কারবারে নেমে রাখাল দুটো পয়সার মুখ দেখতে সুরু করছে।

পাতা সুখা আর সিগারেটের নতুন ছোটখাট দোকান, পাইকারি মাল কিনে খুচরো বেচার লাভ, তাও আবার রাজীবের সঙ্গে বখরায়। তবু, সেই আগেকার কেরাণীগিরির চেয়ে ভাল রোজগার হচ্ছে বৈকি তার। বেকার হয়ে তিনটে

টুইসনি করেও যে শোচনীয় অচল অবস্থায় পড়েছিল, সেটার অবসান হয়েছে।

টুইসনির টাকা পেলে তবে রেশন আসবে, বাজার আসবে এবং উনানে হাঁড়ি চড়বে, এই অসহ্য দুর্দ্দশা আর নেই। এখন সে চোরাবাজার থেকে দু'পাঁচ সের চাল যখন খুসী কিনতে পারে, দু'বেলা মাছ খাওয়াতে পারে সাধনাকে, ছেলের জন্য রোজের দুধ দরকার হলে আরও আধসের বাড়িয়ে দিতে পারে।

এই সেদিনও আধপোয়া দুধ বাড়াতে পারে নি বলে ছেলেকে মাই ছাড়াতে পারে নি সাধনা। ছেলে দস্যুর মত শুষেছে আর ব্যথায় টন টন করেছে তার আধ শুকনো মাইগুলি।

ব্যাঙ্কে কয়েক শ' টাকাও জমেছে রাখালের।

কিন্তু টুইসনি একেবারে ছাড়ে নি রাখাল, সকালে বিশুকে আর সন্ধ্যায় প্রভাকে নিয়মিত পড়ায়। দু'নম্বর ছেলেটিকে পড়াবার সময় পায় না। আগে ভোরে উঠে বিশুকে পড়িয়ে সটান চলে যেত এই ছাত্রটির বাড়ী, এখন যায় দোকানে। রাজীব অবশ্য তার আগেই দোকান খুলে বসে।

লাভে তো ভাগ বসাবেই, ব্যবসাটাকে কোনদিকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবার ঝোঁক চাপবে তাও ঠিক নেই, তবু নগদ দুটি হাজার টাকা দিয়ে রাখাল যে ব্যবসাটা তার সুরু করতে সাহায্য করেছে তাতেই রাজীব কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে।

রাজীব বলে, আপনি ভাই যখন খুসী আসবেন, যতক্ষণ

খুসী থাকবেন, কোন হাঙ্গামা করতে হবে না আপনার। আপনি টাকা দিয়েছেন তাই ঢের।

রাখাল কিন্তু আপিসের ডিউটি করার মত ঘড়ি ধরে নিয়মমত দোকানে যায়, রাজীবের সঙ্গে খাটে। রাজীবের সসঙ্কোচ প্রতিবাদ কানে তোলে না।

বলে, না ভাই, হাত পা গুটিয়ে বাবু সেজে বসে থাকতে পারব না। টাকা আপনিও দিয়েছেন আমিও দিয়েছি, আপনি সব ঝন্‌ঝাট পোয়াবেন আর আমি লাভের ভাগটুকু নেব, তা হয় না।

ঃ ঝন্‌ঝাট কি? এই কাজ করে এসেছি চিরকাল, আমাদের কি গায়ে লাগে? আপনি শিক্ষিত মানুষ, বিদ্যাচর্চ্চা হল আপনার কাজ। এসব নোংরামি কি আপনাদের সয়? আপনার টাকাটা না পেলে দোকান ষ্টার্ট হত না আমার। আপনার কাছে কেনা হয়ে আছি দাদা।

ঃ ও কথা বলবেন না। আমার টাকা না পেলেও আপনি ঠিক দোকান দিতেন, অন্য একজন ঠিক ভিড়ে যেত আপনার সঙ্গে। আমার মত আনাড়িকে পার্টনার করেছেন, আমারি সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে।

রাজীব সবিনয়ে বাতিল করে দেয় তার কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন, কিন্তু খুসী আর তৃপ্তি যেন চোখে মুখে তার ধরে না। সেই যে যেচে একদিন সে রাখালের চাকরী করে দিতে চেয়েছিল তার আগেকার কারবারের বজ্জাত পাষণ্ড পার্টনারটির মারফতে, চাকরীর নামে মারাত্মক এক চোরামির ফন্দিতে জড়িয়ে

পড়ার উপক্রম ঘটেছিল রাখালের, সেজন্য লজ্জার সীমা ছিল না রাজীবের। বেকার রাখাল সোজাসুজি পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরী প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বাঁচিয়েছিল বলে রাজীবও যেন বেঁচে গিয়েছিল। শ্রদ্ধার যেমন তার সীমা থাকে নি মানুষটার উপর, না জেনে না বুঝে ভাল করার নামে তাকে বিপদে ফেলতে গিয়েছিল বলে মরমে মরে থাকাও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি বহুদিন।

চাকরী করে না দিতে পেরে থাক সাথে নিয়ে ব্যবসায়ে নামিয়ে দু'পয়সা আয়ের ব্যবস্থা সে যে তার করে দিতে পেরেছে, এজন্য তাই আনন্দের সীমা নেই রাজীবের। রাখাল কৃতজ্ঞভাবে কথা বললে তার খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা গোল-গাল মুখে দাঁতন-ঘষা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফোটে, ছোট ছোট ধীর শান্ত চোখে ঘন ঘন খুসীর পলক ফেলা চাঞ্চল্য আসে।

খাঁটি সহর এলাকায় ট্রাম চলা বাস চলা রাস্তার ধারে ছিল রাজীবের আগের দোকান—আগের সেই বজ্জাত পার্টনার দীননাথের সঙ্গে। সে দোকান গেছে যাক, রাজীবের এখন আর আপশোষ নেই। কি বোকাই তাকে বানিয়েছিল হারামজাদা! সাধারণ দোকানদার সে, পাইকারি কিনে খুচরো বেচার সাধারণ ব্যবসায়ী, তাকে উঁচুদরের ব্যবসায়ী করার লোভ দেখিয়ে, বড়বাজার থেকে মাল কেনার বদলে বড়বাজার যেখান থেকে যেভাবে মাল কিনে আনে সেখান থেকে সেইভাবে মাল আনিয়ে ব্যবসা ফাঁপানোর ভাঁওতা দিয়ে, ঘুষ দিয়ে যোগাড় করা কয়েকটা ওয়াগনের সরকারী পারমিট

দেখিয়ে, একজন মন্ত্রিমশায়ের একজন ভাগ্নেকে দোকানে মহা সমাদরে চা বিস্কুট খাইয়ে, কি ভাবেই না মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছিল তার।

তারপরেই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত, একেবারে শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হত, যদি না বাসন্তী গায়ের সব গয়না খুলে দিত, ট্রাঙ্কে তার বিয়ের বেনারসীর নীচে লুকানো নোট কাঁচা টাকা আর ভাঙা গয়নার সোণায় হাজার পাঁচেক টাকা বার করে দিত!

কত জন্ম তপস্যা করে না জানি সে এমন বৌ পেয়েছে, এমনি চরম বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য যে পাঁচ ছ' বছর ধরে কেঁদে কেটে ঝগড়া করে নতুন গয়না আদায় করেছে, খুঁটে খুঁটে নোট আর কাঁচা টাকা জমিয়েছে, অচল গয়নার সোনা কিনে রেখেছে!

লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। ভাগ্যে সে স্ত্রৈণ হয়েছিল!

এবার থেকে আরও সে পোষ মানবে বাসন্তীর!

নতুন পার্টনার নিয়ে শুধু বাস-চলা রাস্তায় তিন হাত চওড়া দশ হাত গভীর একটা খোপরে সে নতুন দোকান খুলেছে। মস্ত বড় এলাকার বাজারটার কাছাকাছি।

বাড়ী কাছে হয়েছে দু'জনের।

চার পয়সা বাস ভাড়া লাগে।

রাখাল মাঝে মাঝে ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয়ও দেয়। সেটা আসলে অবশ্য তার বাস্তব-বুদ্ধি।

পাঁচশো সিগারেটের মোড়ক কিনতে আসে একজন খদ্দের। দেখেই বোঝা যায় সে পান বিড়ির দোকানী নয়, খুচরো বেচার জন্য পাইকিরি সিগারেট কিনছে না। তার বেশ ভূষা আর চেহারাটাই সাংস্কৃতিক। বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁতে ভাঙ্গন ধরেছে, মুখের চামড়ায় ছাইবর্ণ নেমে এসেছে—কালো মেয়ের মুখে একগাদা সস্তা পাউডার মেখে তেলচিটে গামছা দিয়ে ঘষে তুলে দেবার মত, তবু চোখে যেন জ্বলছে অতৃপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা, যে ভুখা কোনদিন মেটে না তাকেই বাড়িয়ে যাওয়ার তপস্যার জ্বালা।

আসুন বামাচরণবাবু, আসুন! ভাল আছেন তো? অনেক-দিন বাদে এলেন। এ নতুন দোকানেও আপনি আসবেন—

রাজীব যেন ভাষা খুঁজে পায় না বিনয় জানাবার, নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তার আসনে বসায় বামাচরণকে, দোকানের খেরো বাধানো হিসাবের খাতা পত্রের তলায় আড়াল করা বহু ব্যবহারে জীর্ণ পুরাতন একটি ছাপা বই টেনে বার করে সামনে ধরে বলে, আজও মাঝে মাঝে আপনার কবিতার বইটা পড়ি আজ্ঞে! কবিতা লিখেছেন বটে সত্যি! রামায়ণ পড়ি মহাভারত পড়ি, প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হয় না পড়ে। তখন আপনার বইটা পড়ি।

বামাচরণ মৃদু মৃদু হাসে। রাজীবের দেওয়া সিগারেটটা ধরায়।

রাজীব বলে, আর লিখলেন না? বারো চোদ্দ বছর আগে লিখেছিলেন এ বইটা, আর লিখলেন না?

দেখিয়ে, একজন মন্ত্রিমশায়ের একজন ভাগ্নেকে দোকানে মহা সমাদরে চা বিস্কুট খাইয়ে, কি ভাবেই না মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছিল তার।

তারপরেই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত, একেবারে শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হত, যদি না বাসন্তী গায়ের সব গয়না খুলে দিত, ট্রাঙ্কে তার বিয়ের বেনারসীর নীচে লুকানো নোট কাঁচা টাকা আর ভাঙা গয়নার সোণায় হাজার পাঁচেক টাকা বার করে দিত!

কত জন্ম তপস্যা করে না জানি সে এমন বৌ পেয়েছে, এমনি চরম বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য যে পাঁচ ছ' বছর ধরে কেঁদে কেটে ঝগড়া করে নতুন গয়না আদায় করেছে, খুঁটে খুঁটে নোট আর কাঁচা টাকা জমিয়েছে, অচল গয়নার সোনা কিনে রেখেছে!

লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। ভাগ্যে সে স্ত্রৈণ হয়েছিল!

এবার থেকে আরও সে পোষ মানবে বাসন্তীর!

নতুন পার্টনার নিয়ে শুধু বাস-চলা রাস্তায় তিন হাত চওড়া দশ হাত গভীর একটা খোপরে সে নতুন দোকান খুলেছে। মস্ত বড় এলাকার বাজারটার কাছাকাছি।

বাড়ী কাছে হয়েছে দু'জনের।

চার পয়সা বাস ভাড়া লাগে।

রাখাল মাঝে মাঝে ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয়ও দেয়। সেটা আসলে অবশ্য তার বাস্তব-বুদ্ধি।

পাঁচশো সিগারেটের মোড়ক কিনতে আসে একজন খদ্দের। দেখেই বোঝা যায় সে পান বিড়ির দোকানী নয়, খুচরো বেচার জন্য পাইকিরি সিগারেট কিনছে না। তার বেশ ভূষা আর চেহারাটাই সাংস্কৃতিক। বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁতে ভাঙ্গন ধরেছে, মুখের চামড়ায় ছাইবর্ণ নেমে এসেছে—কালো মেয়ের মুখে একগাদা সস্তা পাউডার মেখে তেলচিটে গামছা দিয়ে ঘষে তুলে দেবার মত, তবু চোখে যেন জ্বলছে অতৃপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা, যে ভুখা কোনদিন মেটে না তাকেই বাড়িয়ে যাওয়ার তপস্যার জ্বালা।

আসুন বামাচরণবাবু, আসুন! ভাল আছেন তো? অনেক-দিন বাদে এলেন। এ নতুন দোকানেও আপনি আসবেন—

রাজীব যেন ভাষা খুঁজে পায় না বিনয় জানাবার, নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তার আসনে বসায় বামাচরণকে, দোকানের খেরো বাধানো হিসাবের খাতা পত্রের তলায় আড়াল করা বহু ব্যবহারে জীর্ণ পুরাতন একটি ছাপা বই টেনে বার করে সামনে ধরে বলে, আজও মাঝে মাঝে আপনার কবিতার বইটা পড়ি আজ্ঞে! কবিতা লিখেছেন বটে সত্যি! রামায়ণ পড়ি মহাভারত পড়ি, প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হয় না পড়ে। তখন আপনার বইটা পড়ি।

বামাচরণ মৃদু মৃদু হাসে। রাজীবের দেওয়া সিগারেটটা ধরায়।

রাজীব বলে, আর লিখলেন না? বারো চোদ্দ বছর আগে লিখেছিলেন এ বইটা, আর লিখলেন না?

লিখেছি। এবার ছাপবো ভাবছি।

নিজে ছাপবেন?

নিজে ছাপবো কি মশায়? আমার গরজ পড়েছে। সবাই ছাপাতে চায় আমার নতুন বইটা। সবাই বলে আপনি অনেকদিন কবিতার বই ছাপান নি, আমায় ছাপাতে দিন আপনার নতুন বইটা। কাকে দেব তাই ভাবছি।

ছাপানো হলে একটা বই দেবেন কিন্তু আমায়।

বলে' দামী সিগারেট প্যাকেটের পাঁচশো সিগারেটের একটা মোড়ক তার সামনে ধরে দিয়ে রাজীব ক্যাশমেমো কাটতে যায়।

বামাচরণ বলে, ইস্, আমি টাকা আনতে ভুলে গিয়েছি একদম!

ঃ দিয়ে যাবেন একসময়।

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গুরু-কবি এবং তার ভক্ত-শিষ্যের আলাপ শুনছিল। এবার সে জোর দিয়ে বলে, ধারে তো দেওয়া যাবে না মাল!

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরায়। বামাচরণকে বলে, ইনি আমার নতুন পার্টনার।

বামাচরণ বলে, ওবেলাই টাকা দিয়ে মালটা নিয়ে যাব।

রাখাল হাত জোড় করে, মাপ করবেন, নতুন দোকান, শ্রীজহরলাল স্বয়ং এক পয়সা ধার চাইলে দেবার সাধ্য নেই!

বামাচরণ রাজীবের দিকে তাকায়। রাজীবও একবার তার

দিকে তাকিয়ে তার পুরাণো ছেঁড়া কবিতার বইটার পাতা উল্টে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকে।

বামাচরণ বলে, আচ্ছা ওবেলায় আসব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও আমাকে।

রাখাল বলে, কি সিগারেট চান?

নাম শুনে বলে, এক প্যাকেট সাড়ে আট আনা।

সাড়ে আট আনা দামের একটা সিগারেট প্যাকেট সে মোড়ক খুলে বার করে সামনে ধরে দেয়। আরেকবার বলে, সাড়ে আট আনা।

বামাচরণ বেরিয়ে যায়।

রাজীব হাসিমুখে তাকায়। তারিফ করে বলে, আপনি সত্যি অলরাউণ্ড মানুষ দাদা! এক কথা এক কাজ, ইদিক উদিক নেই। তা, শক্ত মানুষ না হলে কি পারতেন? অমন অবস্থা গেল, জমানো টাকাটি ঠিক রেখে দিয়েছেন। কি করে যে পারলেন ভাই, ভেবে পাই নে। দু'হাজার টাকা জমা রয়েছে, ইদিকে দিন চলে না—আমি হলে কবে উড়িয়ে দিতাম।

প্রশংসা শুনে একটু যেন ম্লান গম্ভীর হয়ে আসে রাখালের মুখ। রাজীব ভাবে—না জেনে কিছু অন্যায় কথা বলে ফেললাম না কি রে বাবা! তারপর ভাবে—দুঃখদুর্দ্দশার দিনগুলির কথা ভেবে হয় তো এই ভাবান্তর ঘটেছে রাখালের।

রাজীবের এখন চলছে নিজের দুর্দ্দিন।

ছোটখাট এই দোকানটি আবার দিয়েছে বটে রাখালের সঙ্গে, কিন্তু আগের ব্যবসায়ের তুলনায় এ কিছুই নয়।

শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অবস্থা।

নিজের সমস্ত সখ, বাসন্তীর সমস্ত আব্দার, জীবনকে সরস করার নানা উপায় আর উপকরণ, হঠাৎ সব বাতিল করে ছেঁটে ফেলে দিতে হয়েছে। অভ্যস্ত পরিপূর্ণ জীবনটা যেন পরিণত হয়ে গেছে অনভ্যস্ত শূন্য জীবনে।

সর্ব্বাঙ্গে গয়না আঁটা থাকত বাসন্তীর, দামী দামী রঙীণ শাড়ীই শুধু সে পরত। চেয়ে দেখেই সুখে আনন্দে থই থই করত রাজীবের মন। উঠতে বসতে বাসন্তীর ছিল ঝগড়া আর নালিশ, কথা যেন বলত শুধুই মুখ ঝামটা দিয়ে। কিন্তু ওটাই ছিল বাসন্তীর আদর সোহাগ আহ্লাদ আব্দারের বিশেষ ধরণ, ঝগড়াটে হয়ে থেকেই সে একেবারে জমিয়ে দিত রসিয়ে দিত জীবনটাকে।

পাড়ার মানুষ বলে কুঁদুলে বৌ—তারা কি জানবে সে কেমন কোঁদল, তারা কি বুঝবে রাজীব কেন নিরীহ গোবেচারী সেজে থাকত।

তারা তো হিসাব রাখত না বাসন্তী কখন ঝগড়া করে, কখন করে না। দরকারী কথা বলার সময়, রাজীবের শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে থাকার সময়, নিরালায় আদর সোহগের সময় ওই ঝগড়াটে মানুষটাই আবার কেমন অন্যরকম মানুষ হয়ে যেত, রাজীব ছাড়া কে তা জানবে!

সেই বাসন্তীর গায়ে আজ গয়না নেই—গলায় একটি হার আর হাতে তিনগাছা করে চুড়ি। সেই বাসন্তী আজ ঝগড়া করতে ভুলে গেছে।

জীবন-যাত্রার আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন থতমত খেয়ে গেছে, শান্ত নির্জীব হয়ে গেছে। রাজীবের জন্য গভীর সহানুভূতিতে যেন চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কলহ করা নেই, মান অভিমান নেই, লীলা-চাপল্য নেই।

দামী শাড়ীগুলি আজও পরে। অনেক শাড়ী ব্লাউজ জমানো আছে, বহুদিন চলবে। একই জামা কাপড়ে জড়ানো সেই একই মানুষ, তার সেই একই রূপ-যৌবন, তবু রাজীব তার দিকে তাকিয়ে আগেকার পুলক অনুভব করতে পারে না। মনে হয়, তার সে বাসন্তী আর নেই।

বাসন্তী বদলে গেছে।

বদলে গেছে, কিন্তু তিতোও হয় নি, টকেও যায় নি। মুখ গোমড়া করে থাকে না বাসন্তী, হাহুতাশ করে না, কখনো তাকে বিরূপ দেখা যায় না রাজীবের উপর। কোঁদল করা লীলাখেলার উদ্দামতাটুকু বাদ দিয়ে সে ধীর শান্ত হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, সেজন্য আকর্ষণ যে তার কমেছে রাজীবের কাছে মোটেই তা নয়। আজকাল বরং নতুন ভাবে বেশী করে টানছে বাসন্তী—দাসী রাঁধুনীর মত তাকে খাটতে দেখে দিনরাত তাকে সোহাগে আদরে ডুবিয়ে রাখবার সাধটা অদম্য হয়ে উঠেছে।

এত ভাল লাগছে, নতুন রকম ভাল লাগছে, তাকে আদর করতে !

কিন্তু তবু রাজীব আগের বাসন্তীকেই ফিরে চায়।

নাঃ, উঠে পড়ে লাগতে হবে আবার, ব্যবসাটা গড়ে তুলতে হবে। লাখপতি হতে চায় না রাজীব, প্রাসাদ চায় না মোটর গাড়ী চায় না—শুধু আগের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চায়। বাসন্তীর গায়ে গয়না উঠবে, সতেজ জীবন্ত হয়ে উঠে আবার নানা বায়না ধরবে বাসন্তী, ঝঙ্কার দিয়ে ঝগড়ার ঢং-এ আবার সে প্রেমালাপ করবে তার সঙ্গে !

রাখাল তার মনের কথা জানলে নিশ্চয় মনে মনে বলত, এই নাকি প্রেম তোমার কাছে ? টাকায় যা খাড়া ছিল, টাকার অভাবে যা ফুরিয়ে গেছে, আবার টাকা হলেই যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ?

রাজীব এসব বোঝে না। রাখালের কাছে টাকা শুধু টাকাই, রাজীবের কাছে তা নয়। টাকা ছাড়া যদি মানুষ বাঁচে না আর সেটা যদি সস্তা না করে দেয় বাঁচাকে, টাকা ছাড়া ভালবাসা না জমলে সেটা খাপছাড়া হয় কিসে, প্রেমকে সেটা ছোট করে দেয় কোন যুক্তিতে ?

সব দিকে যার টানাটানি তার জীবনে আনন্দ আসবে কোথা থেকে ? দরকার মত যার টাকা নেই তার আবার প্রেম-ভালবাসা, তার আবার বেঁচে থাকার সুখ !

বিড়ির পাতা সুখা তামাকের বস্তায় ভরা ছোট লম্বাটে

ঘরখানায় বসে কেনাবেচার অবসরে দু'জনের মধ্যে যে এরকম দার্শনিক কথা একেবারেই হয় না তা নয়।

সব মানুষেরই দর্শন আছে, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া কোনও মানুষের চলে না। জীবন দর্শন ছাড়া মানুষের জীবন নেই কোন স্তরের। হয় তো সেটা পণ্ডিতের দর্শন নয়, ছাঁকা তত্ত্বের জটিল দর্শন নয়। নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারের দর্শন. নিজের জীবন আর জগতটার একটা নিজের বোধগম্য মানে খাড়া করার দর্শন।

রাজীব হয় তো ওই কথাই বলে, টাকা ছাড়া সত্যি সুখ নেই দাদা।

রাখাল হেসে বলে, টাকার সুখ কি আসল সুখ?

ঃ সুখের আবার আসল নকল আছে নাকি? সুখ হল সুখ, অসুখ হল অসুখ!

ঃ ওভাবে ধরলে কথাটা তাই বটে, আমি বলছিলাম মানুষের মনে করার কথা। আসলে যা সুখ নয় সেটাকেও মানুষ সুখ ভেবে নেয়। ওটাকেই বলছিলাম নকল সুখ। আপনি বলছেন টাকার কথা। টাকা থাকলেই কি সুখ হয়?

ঃ তাই কি হয়? এককাঁড়ি টাকা হলে কি এককাঁড়ি সুখ হয়? টাকা হলেও সুখ একদম নাও হতে পারে। তবে কিনা টাকা নইলেও আবার সুখ কিছুতে হবার নয়, সুখের জন্যও টাকাটি চাই। টাকা বাদ দিয়ে উপোস দেয়া সুখ, সে হল মশাই সাধুসন্ন্যেসীর সুখ।

ঃ আর আপনার আমার সুখ?

ঃ এই ভাত কাপড় আরাম-বিরাম শান্তি—

ঃ তবেই দেখুন, আপনি সব জড়িয়ে দিচ্ছেন। বাঁচার জন্য ভাত কাপড় চাই, আরও কতগুলি ব্যবস্থা চাই। তার মানেই টাকা চাই, টাকা দিয়ে এসব ব্যবস্থা হয়। সুখ শান্তি এসব তার পরের কথা। আগে বাঁচা চাই ঠিক, নইলে সুখ-শান্তি কিসের? কিন্তু বাঁচবার ব্যবস্থা হলেই কি সুখ-শান্তির ব্যবস্থা হয়? সে হল আলাদা ব্যবস্থা। টাকা চাই স্রেফ বাঁচার জন্য, টাকায় সুখ হয় না।

রাজীব দমে গিয়ে দাড়িতে হাত বুলায়, তার চোখ মিটমিট করে। এবার সে ধাঁধাঁয় পড়ে গেছে!

রাখাল আবার বলে, সুখ মানেই হল আনন্দ। আনন্দ মানুষকে সৃষ্টি করতে হয়। টাকা দিয়ে কেনার জিনিষ নয় ওটা। টাকার অভাবে কি হয়? বাঁচার কষ্ট—জীবনে ওই আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় মানুষের। এই হিসেবে যদি বলেন টাকা ছাড়া সুখ হয় না, তাহলে অবশ্য কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই হিসেবটুকু ভুললে চলবে না, সুখ আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে।

রাজীব বলে, কিন্তু রাখালবাবু, আসলেই যে খটকা বাধছে! কোন অভাব নেই, অশান্তি নেই, রোগ বালাই নেই, —পাঁচজনকে নিয়ে এরকম বাঁচাটাই তো সুখের, তাতেই তো আনন্দ মানুষের। আনন্দ আবার ভিন্ন করে সৃষ্টি করতে হয়, তার মানে তো বুঝলাম না মশাই! বিশেষ আনন্দ হয়, বড়দরের আনন্দ হয়, সে আলাদা কথা। তার জন্য সাধন ভজন

যোগটোগ দরকার হয়। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষের সাধারণ আনন্দ, দুঃখ কষ্ট রোগ ব্যারাম না থাকলে সে তো আপনা থেকেই জুটবে।

: জুটবে? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন তবু সুখ-শান্তি আনন্দ জুটবে? অভাব নেই আপনার একার, যে পাঁচজনকে নিয়ে সংসার, বাইরে যে দশজনের সঙ্গে কারবার, তাদের তো আছে। বাইরের মানুষ কেন, ঘরের মানুষের সঙ্গে কত বিষয়ে আপনার স্বার্থের মিল নেই। স্বামী-স্ত্রীর পর্য্যন্ত সব স্বার্থ এক নয়। পাঁচজনের সঙ্গে সামলে-সুমলে সামঞ্জস্য করে আপনাকে চলতে হবে, পাঁচজনকে সুখী করতে হবে, হাসি খেলার আয়োজন করতে হবে, স্নেহ করতে ভালবাসতে হবে, শত্রুর সাথে লড়তে হবে—আরও কত কি করে তবে না খানিকটা আনন্দ জুটবে আপনার।

এবার রাজীব খুসী হয়ে উঠে।

: হাঁ হাঁ, এটা ঠিক বলেছেন ভাই। একেই বলছেন সৃষ্টি করা? তা হলে তো ঠিক আছে কথাটা! এটাকেই তো আমি বাঁচা বলছিলাম! নইলে কলের মত গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচাটা কি আর বাঁচা!

রাখাল অস্বস্তি বোধ করে!

এত সহজে আগাগোড়া বুঝে ফেলার মত সোজা কথা সে বলে নি। তার নিজের কাছেই সবটা স্পষ্ট নয় বলে অস্বস্তি আরও বেশী হয়। এত সহজে স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেল রাজীবের কাছে কথাটা? তার মনে

কত সংশয় কত অস্পষ্টতা—রাজীব আঁচ করে ফেলল আসল কথাটা ?

রাখাল ধরতে পারে না যে তার সঙ্গে রাজীবের এটাই তফাৎ—সে সংশয়ী আর রাজীব বিশ্বাসী। সংসারে ধনীত্ব আর দারিদ্র্য—এটাই তো আসলে তাদের এত কথা বলার মূল কথা। জীবনই তাদের আনন্দ, তার বাড়া আনন্দ আর নেই। বহু জীবনকে দীন করে পঙ্গু করে কিছু জীবন এই পূর্ণতা এই সার্থকতা আত্মসাৎ করতে চায়,—মানুষের সুখ বল আনন্দ বল তার মূল সমস্যা ওইখানেই। নইলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে মানুষ, আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছে—একে বলা যায় জীবনে আনন্দ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই সত্যের ঝাপ্‌টা লেগেছে রাখালের বিশ্লেষণী মনে—সেই ঝলকমারা আলোয় সে মানে খুঁজছে একটি নীড়াশ্রয়ী মানুষের জীবনে আনন্দ আসে কিসে আর কেন।

সংশয়ের জের তাই তার মিটছে না। রাজীবের এসব বালাই নেই। সংঘাত সঙ্কীর্ণতা অসম্পূর্ণতা নিয়ে নীড় বেঁধে ঘর করার যেটুকু আনন্দ তাতেই সে বিশ্বাসী—টাকার অভাবটা না থাকলেই হল !

রাখাল নিজেও ওইটুকুই চায়—যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে বাসন্তীকে নিয়ে সংসার করার—স্বচ্ছলভাবে সংসার করার আনন্দটুকু। কিন্তু সে ভাবে অনেক বড় বড় কথা।

তার চিন্তা আর কাজে, আদর্শ আর জীবনে, সামঞ্জস্য নেই।

তাই তার সংশয়ও ঘোচে না !

৩

এখনো ভোরেই বিশুকে পড়াতে যায়।

আগে মাঝে মাঝে খালি দেবতার প্রসাদের ভাগ পেত এ বাড়ীতে, আজকাল নিয়মিত চা-জলখাবার জোটে।

আগে চা জলখাবার দেওয়া হত না তাকে সম্মান করেই। জমিদার-গিন্নি হলেও বিশুর মা হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গের গাঁ থেকে উৎখাত হয়ে সহরে এসেছে, শতাধিক বছরের পুরাণো ধারার জের টেনে টেনে সেখানে চলছিল জীবন-যাপন,—ক্রিয়াকর্ম ব্রতপূজা গুরুসেবা ইত্যাদি সমেত।

রাখাল উঁচু জাত, ছেলের বিদ্যাদাতা গুরু। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া তাকে কি আর কিছু খেতে দেওয়া চলে?

গুরুদেব সম্পর্কে বিশুর মার সংস্কার ভাঙ্গেনি। তবে সংস্কারটার ডালপালা নতুন জীবনের বাস্তবতা কিছু ছেঁটে ফেলায় ছেলের প্রাইভেট টিচারকে গুরুস্থানীয় করে রাখার বদলে স্নেহ দিয়ে একটু কাছের মানুষ করে ফেলেছে।

ঘরের লোকের চা-জলখাবারের ভাগ তাকে দিতে এখন আর বাধে না বিশুর মার।

স্নেহ আর চা-জলখাবার জুটছে রাখালের, আগে যে অসাধারণ শ্রদ্ধা আর সম্মান পেত সেটা ঘুচে গেছে। শুধু বিশুর মা নয়, এ বাড়ীর প্রায় সকলের কাছেই।

নির্মলা পর্য্যন্ত তাকে যেন আর সমীহ করে না।

এই সরলা ও মুখরা ক্ষীণাঙ্গী বিধবা তরুণীটিকে সেদিন পর্য্যন্ত রাখাল বিশুর মার নিজের বোন বলেই জানত। সম্প্রতি জেনেছে যে সে তার জ্যাঠতুতো বোন।

নির্মলা নিজেই তাকে জানিয়েছে। নির্মলাই প্রতিদিন তাকে চা-জলখাবার এনে দেয়। একটা মানুষকে জলটুকু খেতে দেওয়াও কি ঝি চাকরের মত বাজে মানুষের কাজ ?

বিশু সেদিন সেই সময়টাতেই নীচে গিয়েছিল। বিশুকে নীচে দেখেই নির্মলা তাড়াতাড়ি শুধু খাবারটা নিয়ে এসেছিল, নইলে সাধারণতঃ চা আর খাবার সে একসাথেই আনে।

রাখালের সঙ্গে একা কথা বলার জোরালো ঝোঁক আছে নির্মলার।

সরলভাবে সে নিজেই জানিয়েছে রাখালকে যে নিশ্চিন্ত মনে প্রাণ খুলে কথা কইতে না পেলে কি আলাপ করে সুখ হয় ?

নির্মলা বলেছিল, জানেন, এই ঘরবাড়ী জমিদারী সব আমার পাওনের কথা। বিষয় ছিল আমার বাপের, বিশুর বাপের না। কেমন কইরা উইড়া আইয়া জুইড়া বইল অবাক হইয়া ভাবি।

ঃ সতীশ বাবুর জমিদারি নয় ?

নির্মলা হেসেই আকুল।

ঃ জামাইবাবুর জমিদারি ? কি কথা যে কন ! জমিদারি

ছিল ঠাকুরদাদার। আমার বাপেরে দিয়া গেছিল, ত্যজ্য-পুত্র করছিল দিদির বাপেরে। বুঝলেন না ?

হঠাৎ শুনে জটিল ব্যাপারটা সত্যি বোঝে নি রাখাল।

: আপনার বাবা—দিদির বাবা—?

: দুই ভাই ছিল। ঠাকুরদাদার দুই পোলা।

রাখাল তবু তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু ভাবে।

নির্মলা হেসে বলেছিল, আঃ, আপনে তো জানেন না কিছুই। কথাডা কি, আমার বাপ ছিল ঠাকুরদাদার বড় পোলা, দিদির বাপ ছিল ঠাকুরদাদার ছোট পোলা। বুঝলেন না ?

: হ্যাঁ, এবার বুঝলাম।

: দিদির বাপ, মানে আমার খুড়া, জোর কইরা কইলকাতা আইছিল। কলেজে পড়বো বিলাত যাইবো খিষ্টান হইবো, এইসব মতিগতি ছিল দিদির বাপের। লেখাপড়া শিখবা বিদ্বান হইবা, ঢাকা কলেজে পড়না গিয়া তুমি ? তা না, কইলকাতা আইসা পড়নের ঝোঁক চাপল দিদির বাপের। আমার বাপ ঢাকা কলেজে পড়ছিল। দুই তিনবার ফেল কইরা আর পড়ে নাই, বাড়ীত্ আইসা বইয়া ছিল। কাণ্ডটা ছাখেন ভাইবা, আমার বাপে বিয়া কবছিল আমার মায়ের সতীনরে, পোলাপান হয় নাই কয়েক বছর। ঠাকুরদা খুড়ারে হুকুম দিছিল, তুমি বাড়ী আইসা বিয়া কর। দিদির বাপের কি তেজ! কইয়া পাঠাইল যে বাড়ীও ফিরুম না বিয়াও করুম না।

নির্মলার কথা বলার ভঙ্গিটি অতি মনোরম। যাকে বলে চোখে মুখে কথা কওয়া, কথার সঙ্গে চোখে মুখে ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে চলা। হাতও কাজে লাগে কিন্তু সেটা হাত নাড়া হয় না, কথার টানের ওঠা নামার সঙ্গে সহজ ভঙ্গির মুদ্রা রচনা করে।

কথা বলার চেষ্টা যেন তার ক্ষীণ দেহের একটা আবেগ ব্যাকুলতারও রূপায়ণ।

শুধু কথা বলার ভঙ্গি নয়, কথার সুরটিও তার মিষ্টি।

তার কথা শুনতে বড় ভাল লাগে রাখালের।

বিশু ফিরে আসার পরেও নির্মলা তার কাহিনী বলে যায়। বিশু গোড়ায় উপস্থিত থাকলে এসব কথা হয় তো সে তুলতই না। কিন্তু এতটা এগিয়ে বিশুর খাতিরে এখন আর মাঝখানে থামতে সে রাজী নয়। বিশু শুনুক যা খুসী ভাবুক। যদি বলে দেয়, দিক!

নির্মলা গ্রাহ্য করে না!

নির্মলার কাকাকে ত্যজ্যপুত্র করা হয়। বিয়ে করা নিয়ে বাপের সঙ্গে বিবাদ করে ছ'মাসের মধ্যে সেই বিয়েই সে করল, ঢাকার এক সাধারণ উকিলের মেয়েকে। কে জানে এর মধ্যে আরও কি রহস্য ছিল? যাই হোক, বিয়ের একবছরের মধ্যে জন্মে গেল বিশুর মা। নির্মলার বাবা পর পর তিনবার বিয়ে করেছিল—ছেলেপিলে আর হয় না। শেষে চার বারের বার নির্মলার মাকে বিয়ে করার পর জন্মাল নির্মলা।

বাপের জমিদারি পাওয়া উচিত ছিল নির্মলার। কিন্তু ঠাকুরদাদা আর তার বাপ মারা যাবার পর ত্যজ্যপুত্র খুড়াটি এসে জমিদারি দখল করে বসল। তাকে নাকি ত্যজ্যপুত্র করা হয় নি, কোন দলিল নেই।

ঃ মুখের কথার মূল্য নাই, না? বাপে কইল তুমি আমার পোলা না, তোমারে এক পয়সা দিয়া যামু না। খুড়া কইল, তোমার সম্পত্তি আমার কাছে গোরক্ত, মাতৃরক্ত। সেই মানুষটা দিব্যি উইড়া আইসা জুইড়া বইল জমিদারি, তারে যে বাপে ত্যাগ করছিল তার দলিল নাই!

সাদাসিদে বাস্তব কাহিনীর মধ্যে যেন পুরাণের আমেজ মেলে। মধ্যযুগের জীবন ধারার জের টেনে চলেছে মানুষ আজকের দিনেও। এত যে ওলট-পালট হয়ে গেল জগতে, একরাষ্ট্রে জমিদারী ফেলে আরেক রাষ্ট্রে পালিয়ে এল সতীশ, তবু সে রয়ে গেল জমিদার! সেই যে কবে চাষীর মাটিতে কামড় দিয়েছিল জমিদার, প্রলয় ঘটে গেলেও সে কামড় যেন আলগা হবার নয়!

বাড়ীতে ঢুকবার সময় বাইরের রোয়াকে দু'জন প্রৌঢ় বয়সী মুসলমানকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখছিল রাখাল,—একজন থেলো হুঁকোয় টানছিল তামাক। দেখলেই বোঝা যায় সতীশের চাষী প্রজা, কাল পাকিস্তান থেকে এসেছে, রাত্রে এ বাড়ীতেই ছিল। মাঝে মাঝে এরকম দু'একজন চাষীকে এসে দু'একদিন থাকতে দেখা যায়। বাইরের ঘরে ওদের শোয়ার জন্য পৃথক তক্তপোষের ব্যবস্থা আছে।

খাওয়ার জন্য পৃথক থালা বাসনের ব্যবস্থা আছে, খাওয়ার পর নিজেরাই ধুয়ে মেজে সাফ করে রাখে।

কোথায় সেই জমিদারি—জমিদার এসে আস্তানা গেড়েছে কোথায়। কে জানে এখানে বসে সে কি করে চালাবে জমিদারী, কি করে ভোগ করবে অন্যে যে জমি চাষ করে তার পুরুষানুক্রমে পাওয়া স্বত্ব!

দোতালার ঠাকুর ঘরেই আজও সে বিশুকে পড়ায়। প্রতি পূর্ণিমার বিশেষ পূজার দিন বিশুর মার শোবার ঘরে পড়াবার ব্যবস্থা হত, যে সুযোগে রাখাল বিশুর মার গয়না ক'খানা সরাতে পেরেছিল। সে ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেছে।

পূর্ণিমা তিথিতে ছাত্রকে আর তার পড়াতেই হয় না। রাখালকে বলে দেওয়া হয়েছে, ওইদিন তার ছুটি।

বিশুর মার শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় আজকাল তালা ঝুলতে দেখা যায়।

কে জানে কতদিন পরে বিশুর মা টের পেয়েছিল যে তার ক'খানা গয়না কমে গেছে। একদিন হঠাৎ তার শোবার ঘরের দরজায় তালা দেখে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল রাখালের।

প্রতি পূর্ণিমায় তার ছুটি। বিশুর মার ঘরের দরজায় তালা!

বিশুর মা কি জেনেছে যে গুরুর মত শ্রদ্ধেয় বিদ্যাদাতা রাখাল নিয়েছে গয়না কটা?

কিন্তু দিন যায় কিছুই বোঝা যায় না। কারো কাছে আকারে ইঙ্গিতেও শোনা যায় না যে বিশুর মার ঘর থেকে রহস্যজনক ভাবে দু'হাজারেরও বেশী টাকা দামের সোনার গয়না উধাও হয়ে গেছে।

বিশুর মার কথা আর ব্যবহার থেকেও কিছু টের পাওয়া যায় না।

ব্যবহার খানিকটা বদলে গেছে বিশুর মার। কিন্তু একজন গয়না চুরি করেছে সন্দেহ জাগলে কথা ব্যবহারের যেরকম পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, মোটেই সেরকম নয়। বরাবরই বিশুর মার কথায় ব্যবহারে প্রকাশ পেত স্নেহের ভাব, আগে তারই মধ্যে থাকত একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব, ঘনিষ্টতা প্রকাশ না করার সংযম।

এটাই শুধু অন্তর্হিত হয়েছে।

তার মুখ শুকনো দেখলে আগে বিশুর মা বলত, তোমারে য্যান কাহিল দেখায় বাবা?

আজকাল সে উদ্বেগের সঙ্গে বলে, রাখাল! মুখ শুকনা যে? অসুখ করছে না কি?

আগে শুধু উপর উপর জিজ্ঞাসা করত রাখালের ঘর সংসার আপনজনের কথা। আজকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়।

নিজের হাতে তৈরী করা পিঠা পায়েস খেতে দিয়ে সামনে বসে তার নতুন ব্যবসা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুঁটিনাটি এত কথা জেনে নেয় যে তার শতাংশ জানবার আগ্রহ সাধনার দেখা যায় নি।

ব্যবসায় কত টাকা লাগিয়েছে এবং টাকা কোথায় পেয়েছে, শুধু এই কথাটা সে ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না।

অন্য সব কথা শুনে বলে, বেশ করছ রাখাল। লক্ষ্মী সাইধা ঘরে আসেন না, তেনারে আনন লাগে।

চিন্তিত ও গম্ভীর দেখায় বিশুর মাকে। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। আনমনে বলে, লক্ষ্মীর আবার যাওনের মন হইলে ঠেকান দায়। আমাগো ছাখো না? সব ফেইলা থুইয়া চইলা আইলাম। আদায় পত্র নাই, টাকা আননের হাঙ্গামা, প্রজাগো মতিগতি বিগড়াইয়া গেছে—

হঠাৎ নিজের কথা বন্ধ করে বিশুর মা ডাকে, নির্মলা? রাখালেরে আরেকটু পায়েস দিয়া যা।

পায়েসে থাকে সিদ্ধ করা চাল—জিনিষটা এঁটো। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া যাকে কিছু দেওয়া যেত না, আজ তাকে বিশুর মা যত্ন করে নিজের হাতে রাঁধা পায়েস খাওয়ায়!

শুধু তাই নয়! জিজ্ঞাসা করে, আমার রাঁধা পায়েস বৌমা খাইবো না?

ঃ কেন খাবে না! আমিত খেলাম?

বিশুর মা হাসে।—তুমি ব্যাটাছেলে, মাইয়ালোকের বাছবিচার বেশী থাকে না?

বিশুর মা কি জেনেও চুপ করে আছে? তুচ্ছ করে বাতিল

করে দিয়েছে তার গয়না চুরির অপরাধ ? সন্দেহ হলেও জোর করে মন থেকে দূর করে দিয়েছে সন্দেহটা ?

শুধু সন্দেহ করে অবশ্য মুখে কিছু বলা যায় না সোজা-সুজি। কিন্তু এরকম আত্মীয়ের মত সুমিষ্ট ব্যবহার কি করা যায় আর সেই মানুষটার সঙ্গে ? কথা বলার বদলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে সাধ যায় না ?

ছেলের মাইনে করা মাষ্টার ! ইচ্ছা হয় না তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিতে ?

অথবা সত্যই বিশুর মা তাকে মনেপ্রাণে এতখানি স্নেহ করে বসেছে যে প্রাণঘাতী অভাবের তাড়নায় সে যা করে ফেলেছে সেটা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে ? সামান্য গয়না যা গেছে সে তো আর ফিরবে না, লজ্জা দিয়ে তাকে দমিয়ে দিলে লাভ হবে না, তার চেয়ে সে সামলে-সুমলে উঠুক—একটা অপরাধ করে ফেলেছে বলেই নিজেকে অমানুষ ভেবে সে যেন তলিয়ে না যায় ?

অথবা খটকা যা কিছু সব তার নিজের মনের ? পূর্ণিমার দিন পূজার সমারোহ হয় শুধু এই জন্যই তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, গয়না হারিয়ে গিয়েছে বলেই শুধু সাবধান হবার জন্য ঘরের দরজায় তালা পড়েছে, গয়না হারাণোর ব্যাপারে তার সম্পর্কে কিছুই ভাবে নি বিশুর মা ?

সেটা অসম্ভব নয়। কবে কখন কি ভাবে গয়না ক'টা গেছে বিশুর মা টের পায় নি। একদিন কিছুক্ষণের জন্য সে শোবার ঘরে একলা বসে ছিল শুধু এই জন্য

তাকে সন্দেহ করার কথা হয় তো কল্পনাও করতে পারে না বিশুর মা।

রাখাল বাজারে যায়। বাজারটা বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই দোকানে চলে যাবে।

বাড়ী ফিরতে সাধনা বলে, তোমার বিশুর মা একবাটি পায়েস, এই এত পিঠে আর একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।

বেশ ভাল একখানা রঙীন শাড়ী। দেখে কিন্তু খুসী হতে পারে না রাখাল।

এই একখানা শাড়ী দিতে মরবে না বিশুর মা। যাকে স্নেহ করে তার বৌকে এরকম দশখানা শাড়ীও সে দিতে পারে! কিন্তু এতো শুধু একটা দুর্ব্বলতার নমুনা। অনেককে স্নেহ করে অনেককে দরাজ হাতে দান করার যে স্বভাব জমিদার-গিন্নি বিশুর মার ছিল, এশুধু এখনো সেটা বজায় থাকার নমুনা। জমিদারি ফেলে পালিয়ে এসেও সবদিকে বিরাট চাল বাজায় রেখে চলেছে বিশুর মা। বেহিসাবী অর্থহীন চাল—শুধু জের টানা।

সাধনা বলে, ছেলের মাষ্টার, তাকে এত খাতির!

রাখাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যে চটে যায়। বলে, যা তা বোলো না। খাতির আবার কি? উনি আমায় মায়ের মত স্নেহ করেন।

সাধনা আশ্চর্য্য হয়, আহত হয়। তারপর সেও রাগ করে।

বলে, বড়লোকের সখের স্নেহ! আমি এ কাপড় নেব না।
তোমার মনিব গিন্নির কাপড় তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

রাখাল গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি না নাও, আমি নেব। লুঙ্গি করে পরব।

: জানিয়ে দিও আমি কাপড় নিই নি।

: তোমার দরকার থাকলে তুমিই জানিয়ে দিও।

খুব তাড়াতাড়িই রাগটা পড়ে যায় সাধনার। স্নান করে রাখাল বেরিয়ে যাবার আগেই। গা মুছে ঘরে এসে রাখাল দেখতে পায়, শাড়ীখানা পরে সাধনা দেয়ালে টাঙ্গানো আয়নায় দেখবার চেষ্টা করছে তাকে কেমন মানিয়েছে।

সাধনা একটা বড় আয়না চেয়েছিল। মানুষ-প্রমাণ আয়না, যার সামনে দাঁড়ালে চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

: তুমি আমাকে দেখছো—আগাগোড়া দেখছ। তুমি কি দেখছ আমি সবটা দেখতে পাই নে। শুধু মুখটা দেখি, ঘাড়টা দেখি, কোনরকমে চুলটা বাঁধি।

: নিজেকে দেখে করবে কি?

: তুমি কি ত্থাখো সেটা দেখবো। দাওনা একটা বড় আয়না কিনে?

বেশী দিনের কথা নয়। খোকা যখন জন্ম নেবার প্রথম নোটিশ জানিয়েছে ইঙ্গিতে।

ওরকম আয়না একটা কিনে দিত রাখাল। কী ভাগ্য, ঘটনাচক্রে কেনা হয় নি! তখনকার সেই সুগঠিতা সুললিতা

রূপলাবণ্যময়ী সাধনা এই ক'বছরে রোগা হয়ে কালচে মেরে লাবণ্য হারিয়ে কী দাঁড়িয়েছে সেটা শুধু সে-ই চোখ দিয়ে দেখছে তাই ভাল। তার সহ্য হয়।

বড় আয়নায় আগে নিজেকে নিজের চোখে দেখে রাখলে আজ সেই আয়নায় নিজেকে দেখে সাধনা নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত।

: তুমি পায়েস খাবে না ?

: এক পেট খেয়ে এসেছি।

: এত পায়েস কি করব! নষ্ট করার চেয়ে বিলিয়ে দেওয়াই ভালো! খোকাকে একটু ধরবে, পাঁচ মিনিট ?

: দেরী করো না কিন্তু।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, কেন, আপিস আছে নাকি তোমার!

মুখে তার হাসি দেখতে পায় বলেই অগত্যা রাখাল চুপ করে থাকে, নইলে হয়তো রাগের চোটে আবার একটা কড়া কথা বলে বসত।

তার দোকান সম্পর্কে সাধনার অবজ্ঞা আর উদাসীনতা মাঝে মাঝে গায়ে তার জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কারবারের জন্য কি ভাবে টাকা যোগাড় করেছে সেটা না হয় নাই জানল সাধনা। এই দোকানের কল্যাণে বীভৎস দারিদ্র্যের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এটা কি খেয়াল থাকে না তার ? এমন অনায়াসে অবজ্ঞাভরে বলতে পারে যে দোকানে যাবে সেজন্য আবার তাড়া কিসের ?

হয় তো দোকানের মূল্য আছে সাধনার কাছে, তার দোকানে যাওয়া না যাওয়ার বিশেষ গুরুত্ব নেই। রাজীব দোকান চালায়, রাজীব সব করে—তার দোকানে যাওয়াটা নিছক সখের ব্যাপার। তার গেলেও চলে না গেলেও চলে।

এটা ভাবলে জ্বালা আরও বেশী হয় রাখালের। সেই সঙ্গে বোধ করে একটা খাপছাড়া ভোঁতা বেদনার পীড়ণ। চাকরী আর মাষ্টারি করা ছাড়া সাধনা তার আর কোন যোগ্যতায় বিশ্বাস করে না বলে নয়, সাধনার কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নই তার মনে আসে না। এ শুধু মানসিক বেদনা বোধ, শোক দুঃখ আতঙ্কের মতই বাস্তব কিন্তু চিনে জেনে নেবার মত স্পষ্ট নয়।

নিজের জন্য খানিকটা পায়েস তুলে রেখে সাধনা পায়েসের বাটিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তাকিয়ে যায় আশার দিকে।

ভাত চড়িয়ে আশা তরকারী কুটছিল, সঞ্জীবকে তার অপিসের ভাত রেঁধে দিতে হয়। কত সমারোহ ছিল তার রান্নার, সে সব আজ চুলোয় গেছে। ধার করে করে সঞ্জীব তাকে আরামে বিলাসে রেখেছিল, আজ সে নিরাভরণা হয়ে দিন কাটায়, একটার বেশী তরকারী রাঁধে না।

মাছ খায় একবেলা, সপ্তাহে একদিন কি দুদিন।

আশাকে পায়েসের ভাগ দিতে ইচ্ছা হয় সাধনার কিন্তু সাহস পায় না। আশা হয়তো অপমান বোধ করবে!

পুকুর পাড় ঘুরে সাধনা যায় উদ্বাস্তু কলোনিতে।

আজকাল ওখানে যাতায়াত তার বেড়েছে। দুর্গার নতুন সংসারটা দেখে আসবার আগ্রহটাই তার সবচেয়ে প্রবল। পঁচিশ টাকায় পার করা মেয়ে, তারই কাছে ভোলার মার মাকড়ি বাঁধা রেখে যোগাড় করা পঁচিশ টাকা!

আজও ভোলার মা মাকড়িটা ছাড়িয়ে নিতে পারে নি।

দুর্গা বলে, আসেন দিদি, বসেন।

পায়েস দেখে বলে, ওমা! নিজের হাতে পায়েস আনছেন? আমারে ক্যান ডাইকা পাঠাইলেন না দিদি, গিয়া নিয়া আইতাম?

: তাতে কি, আমি নিয়ে এলে দোষ আছে কিছু?

: না না, দোষের কথা কই নাই।

বিয়ের পরেও দুর্গার চুলের আধা রুক্ষতা অদৃশ্য হয় নি। নিরুপায় নিরাশ্রয় এক মানুষের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়ের অনুষ্ঠানের মারফৎ এসেছে আরেক নিরুপায় মানুষের ঘরে, একরাশি চুলে তেলের কমনীয়তা সে কোথা থেকে কি দিয়ে কেমন করে আনবে! সাধনা ভুলে যায় নি। ভুলে যায় নি যে রাখালের বেকারত্ব তার চুলেও ক্রমে ক্রমে রুক্ষতা এনে দিচ্ছিল—রান্না করার এবং মাথায় দেওয়ার দুটো তেলের শিশিই খালি দেখে তাকে তখন হিসাব করে বেছে নিতে হত কোন তেলটা আনতে দেবে।

মুখের শুকনো ভাবও ঘোচেনি দুর্গার। মনের আনন্দ আর আহ্লাদে বুঝি এ শুকনো ভাব ঢাকা পড়বারও নয়, অতি বাস্তব অভাবের এটা সৃষ্টি। তবে শুকনো মুখেও তার ঘনিয়ে

আছে একটা সুখের উত্তেজনা, চাউনি হয়েছে আরও ঘন ও গভীর।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, বিষ্ণু ঘরে নেই?

ঃ ওই ব্যাপারে গেছে।

ব্যাপার জানে সাধনা। এই জমি থেকে ছোট কলোনিটা উৎখাত করার একটা অপচেষ্টা চলেছে। জমিটা প্রভাত সরকারের। তার প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ীটার গা ঘেঁষে বহুকাল জংগল হয়ে পড়েছিল জমিটা, কোনদিন কারো কোন কাজেই লাগে নি। সামান্য কিছু খাজনার বিনিময়ে আশ্রয়হীন মানুষগুলিকে জঙ্গল সাফ করে কাঁচা ঘর তুলে বাস করতে দেবার প্রস্তাব সে খুসী হয়েই গ্রহন করেছিল। সিকি মাইল তফাতে নাগদের মাঠে হোগলার ঘরের যে প্রকাণ্ড কলোনিটা গড়ে উঠেছে, সেখানকার বাসিন্দাদের নিজেদের সমিতি আর স্থানীয় উদ্বাস্তু সমিতি মিলিতভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। ওই কলোনির বাড়তি লোক আর নবাগত কয়েকটি পরিবার এখানে এই ছোট কলোনিটি গড়েছে।

জংগল ঢাকা পোড়ো অব্যবহার্য জমিটাকে চোখের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ছোট ছোট ঘর উঠে ছবির মত রূপ নিতে দেখে প্রভাতের মাথায় কে জানে কি এক নতুন পরিকল্পনা এসেছে জমিটাকে অন্য কাজে লাগাবার, এখন সে কলোনির বাসিন্দাদের তুলে দিতে চায়। অনেকটা দূরে, সহরতলীর প্রায় শেষপ্রান্তে আর একখণ্ড জমি সে এদের দেবে, নিজের খরচে ঘরগুলি সেখানে সরিয়ে দেবে।

সে জায়গাটা ভাল নয়। জমিটা রাস্তার ধারেই বটে এবং রাস্তার এধারে কয়েকখানা ঘরবাড়ীও আছে, কিন্তু জমিটা শুধু নীচু মাঠ আর জলা, খানিক তফাতে রেল লাইন।

কলোনির লোকেরা ওখানে উঠে যেতে রাজী হয় নি।

এই নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে।

দুর্গার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কলোনির নানাবয়সী কয়েকটি মেয়ে বৌ এসে দাঁড়ায়। এদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিচয় ঘটেছে।

সকলের সঙ্গে সে আলাপ করে। ভুবনের বৌ রাজু প্রায় সমবয়সী, তার কাছে খবর নেয় ভুবনের কাজ হয়েছে কি না। দীনেশের ষাট বছরের বুড়ী মাকে জিজ্ঞাসা করে, দীনেশের বৌ পদ্মর জ্বর কমেছে কি না। তের বছরের তুলসীর কাছে জেনে নেয় তার মা কি করছে। এই সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে করতে উঠে পড়ে কলোনি থেকে তাদের তাড়াবার চেষ্টার কথা।

দীনেশের বুড়ী মা বলে, আমাগো মইরাও শান্তি নাই!

সাধনা বলে, সত্যি, এ কি অন্যায় জুলুম!

এদের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথায় মেতে গিয়ে সাধনা ভুলে যায় যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবে বলে সে রাখালের কাছে ছেলেকে রেখে এসেছে।

আধ ঘণ্টারও বেশী দেরী হয়ে যায় তার বাড়ী ফিরতে।

বাড়ী ফিরে ছাখে, তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বাসন্তী গল্প করছে শোভার সঙ্গে, রাখাল বেরিয়ে গিয়েছে।

বাসন্তী বলে, বাঃ ভাই, বেশ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? যা রাগটা রেগেছে তোমার কত্তাটি!

ঃ ছি ছি, কথা কইতে কইতে একেবারে ভুলে গিয়েছি!

ঃ বেশ করেছো। রোয়াকে বসে গম ঝাড়ছি, মুখ অন্ধকার করে রাখালবাবু তোমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে হাজির। গম ঝাড়ছি দেখে বললেন, ও, আপনিও কাজে ব্যস্ত! আমি বললাম, এ কাজ দু'ঘণ্টা বাদে করলেও চলবে, ওবেলা করলেও চলবে, কি বলবেন বলুন না? বললেন তোমার কথা— আসছি বলে ছেলেকে গছিয়ে দিয়ে তুমি নাকি ভেগেছো, উনি বেরোতে পারছেন না। আমি বললাম, আমার কাছে রেখে যান না খোকাকে? বললে তুমি বিশ্বেস করবে না ভাই, ছেলেটাকে দড়াম করে রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন। আমিই যেন অপরাধ করেছি! খোকা বেচারা কেঁদে যায় আর কি, কত কষ্টে যে ঠাণ্ডা করেছি তোমার ছেলেকে।

রসিয়ে রসিয়ে কথা কইতে বড় ভালবাসে বাসন্তী। কথা বলার এমন একটা নাটকীয় উপলক্ষ পেয়ে তার যেন খুসীর সীমা নেই। এতক্ষণ বোধ হয় সবিস্তারে শোভার কাছে বিবরণ দিচ্ছিল, সাধনা এসে পড়ায় আরেকবার বলার সুযোগ পেয়েছে।

পরণে তার বেনারসী, জর্জেটের ব্লাউজ! দেয়ালের ওপাশ

থেকে একই বাড়ীর একদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একদিকের দরজা দিয়ে এপাশে আসবার জন্য সে বেনারসী শাড়ী আর জর্জেটের ব্লাউজ পরে নি, এই দামী জামা কাপড়ে রাণী সেজেই সে কুলো দিয়ে রেশনের গম ঝাড়ছিল।

রাজীবের জেল ঠেকাতে আর নতুন করে ব্যবসা গড়ে তুলতে সে শুধু জমানো টাকা আয় গায়ের গয়নাই দেয় নি, তার জন্য কাপড় কেনা নিষেধ করে হুকুম জারি করেছে।

দামী দামী ভালো ভালো শাড়ী জমেছে অনেক, সর্ব্বদা পরে পরে সেগুলি সে ছিঁড়ছে। অসময়ে তার জন্য কম দামী কাপড় কেনার পয়সা খরচ করারও দরকার নেই রাজীবের।

বলে, দু'বছর চালিয়ে দেব।

রাজীবের জন্য, নিজের স্বামীর জন্য। দেশ জুড়ে কাপড়ের হাহাকারের জন্য যদি তার এই সিদ্ধান্ত হত যে যারা উলঙ্গিনী হতে বসেছে তারা যতদিন কাপড় না পায় আমি একখানা কাপড়ও কিনব না, তাঁতের রঙবেরঙের শাড়ী থেকে জর্জেট বেনারসী পর্যন্ত জমানো শাড়ীগুলি আটপৌরে কাপড়ের মত ঘরে পরে ছিঁড়ে প্রায়শ্চিত্ত করব এতদিন কাপড়-চোরদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য!

সাধনা ভাবে, এসব কথা কি উঁকিও মারে না বাসন্তীর মনে?

সাধনা কিনা সত্য সত্য ঘুরে এসেছে উদ্বাস্তু কলোনি থেকে, নিজের চোখে দেখে এসেছে মেয়েরা সেখানে কি দিয়ে কি ভাবে লজ্জা নিবারণ করছে, জেনে এসেছে মালতী কেন আজ তিনদিন ঘর থেকে বার হতে পারে না—বেনারসী পরা

বাসন্তীকে দেখে কথাটা তাই তার জোরের সঙ্গে মনে পড়ে। স্বামীর জন্য—বিপদগ্রস্ত স্বামী যাতে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সামলে সুমলে নিতে পারে, আবার ফিরিয়ে আনতে পারে সোনার গয়না আর জর্জেট বেনারসী কিনে দেবার সামর্থ্য—বাসন্তীর পণ শুধু এই জন্য।

মোটাসোটা আঁটোসাঁটো ফর্সা সুন্দরী স্বামী সোহাগিনী বৌ। স্বামী বই সে জানে না।

পাঁচ মিনিটের যায়গায় আধঘণ্টারও বেশী দেরী করে ফেলায় নিজেকে সত্যই অপরাধিনী মনে করে দ্রুতপদে সসঙ্কোচে সাধনা বাড়ী ফিরেছিল। ভাববার চেষ্টাও করেছিল কি ভাবে কি বলে ক্রুদ্ধ রাখালের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে।

বাসন্তীর কাছে রাখালের কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে তার মুখে মেঘ নেমে আসে।

তবু সে চুপ করে থাকে।

তার চুপ করে থাকা আর তার মুখের কঠিন ভাব ভড়কে দেয় বাসন্তীকে। সে একটু শঙ্কিত ভাবেই দরদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এরকম কি করতে আছে ভাই? কিছু হয়েছে নাকি? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভাবনা নেই। যতই রাগ হয়ে থাক, ফিরে আসতে আসতে রাগ অনেকটা জুড়িয়ে যাবে। যা ঘটেছিল বললেই তখন মিটে যাবে ব্যাপার। বরং উল্টো তুমিই ভাই এক হাত নিতে পারবে মানুষটাকে, বলতে পারবে, এখুনি আসব বলে গেলাম আর ফিরলাম না, একবারটি দেখতে হয় তো বিপদে আপদে পড়েছি নাকি, কি হল

আমায় ? ডাকাতে ব্যাঙ্ক লুঠছে, একটা মেয়েছেলেকে একলা পেয়ে—

ঃ তুমি আর পেনিও না। দিনের বেলা দশজনের মধ্যে কি আবার হবে ? কলোনির ওদের সাথে কথা কইতে কইতে দেরী হয়ে গেছে। দেরী হয়ে গেছে, কি করা ? তাই বলে এ রকম গালাগালি করবে! আমি শুধু ছেলে আগলে থাকব, আমার অধিকার নেই আধঘণ্টা বাইরে থাকার ? চাকরী তো নয়, দোকানে যাবে। একটু দেরী করে দোকানে গেলে কি পৃথিবী রসাতলে যেত ? ভারি তো বিড়ির দোকান!

সাপের ফণা তোলার মত মুখ উঁচু করে বাসন্তী বলে, ছি, ভাই, ছি! যার থেকে ভাত কাপড় তাকেই তুমি অমন তাচ্ছিল্য কর! বিড়ির দোকান বলে তোমার ঘেন্না! আমি তো বিড়িওয়ালার বৌ, আমায় তবে নিশ্চয় ঘেন্না কর!

সাধনা বিপাকে পড়ে নরম সুরে বলে, আমি তাই বলেছি? তোমার সব উল্টো মানে। আপিস তো নয়, নিজেদের দোকান, আধঘণ্টা দেরী করে গেলে কি হয়! আমি যে এদিকে খেটে মরছি, আমার ছুটি চাই না ? আমি আধঘণ্টা ছুটি নিলেই দোষ ?

বাসন্তী গালে হাত দেয়। তুমি থেকে একেবারে তুই-এ নেমে আসে। বলে, ছুটি নিয়েছিস ? ছুটি ? তোর নিজের সোয়ামী, নিজের ঘর সংসার, তোরি সব, তুই আবার ছুটি নিবি কার কাছে ?

সাধনা একটু হাসে, তা বৈকি, আমারি সব, আমিই

হর্তাকর্তা বিধাতা। আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলে তাই মেজাজে আগুন ধরে যায়!

: হাওয়া খেতে গেছিলি? বলে গেছিলি, আমি আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলাম? কাজে বেরোবে মানুষটা, একটু ধরো বলে ছেলেকে চাপিয়ে দিয়ে গেলি উধাও হয়ে! রাগ তো করবেই মানুষটা, একশোবার করবে। নিজেই তো বুঝিস রাগ করবে। নিজেই তো তুই ইচ্ছে করে রাগিয়েছিস !

বলতে বলতে আবেগে উত্তেজনায় থম থম করে বাসন্তীর মুখ। এ পর্য্যন্ত কখনো সাধনা তার এরকম ভাবান্তর ঘটতে দেখে নি। কড়া সুরে বাসন্তী বলে, ওই এক ধুয়া উঠেছে শুনি, আমরা নাকি দাসী বাঁদী। যতই সুখে রাখুক সোহাগ করুক, আসলে আমরা চাকরানী! ওনারাই কত্তা, মালিক, খুসী হলে মাথায় রাখেন খুসী হলে পায়ের নীচে মাড়ান। এমনি হই বা না হই, আসলে দাসী বাঁদী! এ আসল আবার কিরে বাবা! বেশ তো, দাসী হলে দাসী, বাঁদী হলে বাঁদী—তাই যদি রীত হয় সংসারের, তাই সই! তা নিয়ে মাথায় ঘা করে আর করছি কি? কিন্তু সব নাকি ওনাদের খুসীতে হয়! আমরা কিনা পুতুল, ওনাদের হুকুমে উঠি বসি, খুসী অখুসী খাটাই না মোটে! এমন ছিষ্টিছাড়া ইস্তিরি তো সংসারে দেখি নি ভাই! সবাই আমরা খুসী খাটাই, কর্তালি করি। আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের কায়দায় আমরা জোর খাটাই।

আশার দিকে চেয়ে বাসন্তী লজ্জার সঙ্গে হাসে, আশাদি চুপ করে শুনছেন, আমি বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম !

আশা সত্যই এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি।

আগেও সে কম কথা বলত, বেকারের বৌ সাধনার সঙ্গে এক রকম ভালমন্দ কোন কথাই বলত না। তার এই অবজ্ঞায় কি ভাবেই যে মাঝে মাঝে জ্বলে যেত সাধনার গা, এমন একটা উগ্র ইচ্ছা জাগত গায়ে পড়ে আশাকে অপমান করবার।

কিন্তু সে আশা আর নেই।

এখন সে মনের দুঃখে চুপ চাপ থাকে এটা জানা থাকায় তার নীরবতায় কেউ ক্ষুণ্ণ হয় না। আগে সে চলত দূরত্ব বজায় রেখে, আজকাল নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

বাসন্তীর কথা শুনে আশা বলে, আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে।

ঃ খুব বক বক করি, না ?

ঃ তাতে কি, প্যান প্যান তো করেন না। একজন কম একজন বেশী কথা কইবে, তাই তো উচিত।

সাধনা ভাবে, এতই সামান্য কি তফাৎটা ? হুড়মুড় করে দুর্দ্দিন এসে ঘাড়ে চেপেছে দুজনেরি, বাসন্তী বরং অভাবে পড়েছে আশার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থা থেকে। বাসন্তী কাতর হয় নি, খানিকটা সামলে নিয়েছে। সে ভুলতে পারে, হাসতে পারে, বক বক করতে পারে। আশা যেন কাবু হয়ে

পড়েছে একেবারে, মনের জোরে সর্ব্বদা নিজেকে তার খাড়া রাখতে হয়।

সে নিজে? তার যখন ছিল দুর্দ্দশা, এরা দু'জন ছিল সুখে। আজ এদের অবস্থা গেছে বদলে, তার শেষ হয়েছে অসহ্য অভাবের দিন। নিজে সে বদলায় নি?

৪

বর্ষা আসি আসি করছে।

এলে বাঁচা যায়। গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষের।

প্রতিবারই মনে হয়, এবারের গরম বুঝি আর সয় না। কিন্তু এ যেন শুধু কথা ফেনিয়ে বলার মত বাড়িয়ে মনে হওয়া। কে না জানে যে গরম প্রতিবারই অসহ্য মনে হয় কিন্তু দিব্যি সয়ে যায় মানুষের, ফ্যানের বদলে যাদের শুধু ভাঙ্গা হাত পাখা সম্বল, তাদের আরও সহজে।

এবার কিন্তু সত্যই অসহ্য হয়েছে। নতুন রকম ভীষণ রকম গরম পড়েছে বলে নয়, জীবনটাই অনেক নতুন আর বাড়তি শোষণে সহ্য শক্তিতে ভাটা পড়িয়ে দিয়েছে বলে। বেঁচে থাকাটাই এমন ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গরমের কষ্টটা মনে হচ্ছে প্রকৃতির ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের মত!

গরমকে এয়ার কণ্ডিসন্‌ড্ করার স্বাদটা এ পাড়ার কয়েক

জনের চোখে দেখা আছে। কয়েকটা সিনেমায় বাস্তবকে মার্কিনী আর খানিকটা বৃটিশ ধরণে উড়িয়ে দেবার প্রচারের সঙ্গে ঘণ্টা দুই গরম দেশে গরম কালে সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা ভোগ করতে দেওয়া হয়।

সাধনা বাসন্তী বা আশারা কেন, বাসন্তীর ঝি বকুল পর্য্যন্ত অনেকবার এ ঠাণ্ডা সহ্য করেছে।

ঝির কোলে মেয়েকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশে বসিয়ে বাসন্তী সিনেমা দেখত। যাত্রা থিয়েটার দেখতে যাবার স্বদেশী সেকেলে ফ্যাসনকে সে বিদেশী সিনেমায় যাওয়া পর্য্যন্ত টেনে এনেছিল।

এখন অবশ্য সে সিনেমার নেশা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, বকুলকেও ছাড়িয়ে দিয়েছে।

দুঃখের দিনে সিনেমায় গিয়ে দু'দণ্ড দুঃখ ভুলে থাকা যায়, অভাবের অনেক জ্বালা থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য গরীবেরাই বেশী সিনেমা ছাখে—এসব কথার মানে বোঝে না বাসন্তী। কেনরে বাবা, এত খাতির করা কেন দুঃখকে? আনন্দ করার জন্য নয়, দুঃখকে একটু এড়িয়ে যাবার জন্য সিনেমায় যেতে হবে?

সিনেমা ছাড়ার চেয়ে বকুলকে ছাড়তেই বরং তার কষ্ট হয়েছে ঢের বেশী।

বকুল কেঁদে কেটে অনর্থ করে বলছিল, মোকেও শেষে ছাঁটাই করলে মা? এত বছর খাটছি তোমার সংসারে?

বাসন্তীও কেঁদে ফেলেছিল।—আমরাও যে ছাঁটাই হয়েছি বাছা? তোকে পুষব কি করে? মাসে তুই দু'বার তিনবার মাইনে নিয়েছিস, একবার দেবার সাধ্যি যে আমার ঘুচে গেছে লো হারামজাদি! আমি এক টুকরো মাছ খেলে তুই দু'টুকরো খেতিস্, আমায় যে ডাল দিয়ে ডালের বড়া দিয়ে চালাতে হচ্ছে মা?

ঃ কেঁদোনি মা। পায় পড়ি তোমার। ঝাঁটা মেরে দূর করে দাও মোকে, তুমি কেঁদোনি। আচ্ছা মা, এমন ছিষ্টিছাড়া অঘটন কেমন করে ঘটল বল দিকিন, কে ঘটাল? এতকালের চাকরাণীটাকে বিনে মায়নায় ভাত কাপড়ে রাখতে পারবে না, এমন দশা কেন হল তোমার? সারা দেশে কি শনির নজর পড়েছে?

ঃ স্বাধীন হতে গেলে এরকম হয়।

ঃ স্বাধীন হইনি তবে? স্বাধীন হলে কি হবে? তুমি ফের রাখতে পারবে মোকে?

আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বকুল বলেছিল, কবে তবে আমরা স্বাধীন হব মা? কবে সেদিন আসবে মা?

পরণে তার বাসন্তীরই সাতাশ টাকা দামের পুরাণো একটা তাঁতের শাড়ী। প্রায় নতুন শাড়ীটা। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল বকুল। সাত মাসের অকাল প্রসবের রক্তে ভেসে গিয়েছিল তার ছাপা শাড়ীটা, মাস তিনেক আগে বাসন্তীই একটি মাসও

আর টিঁকবে না বলে সঙ্কোচের সঙ্গে যে শাড়ীটা তাকে দান করেছিল।

বাসন্তী ব্যবহার করলে একমাসেই ছাপা শাড়ীটা ছিঁড়ে ফেঁসে যেত সন্দেহ নেই, তিন চার দিন পরে পরেই সে লণ্ড্রীতে সাফ করতে দিত শাড়ীটা। বকুল তিনমাস একটানা ব্যবহার করেছে, দু'এক যায়গায় সামান্য মোটা সেলায়ের চিহ্ন পড়া ছাড়া কোথাও একটা নতুন ফুটো, পয়সার মত ফুটোও হয় নি শাড়ীটাতে।

কাপড়টা খুলে ফেলে সাতাশ টাকার তাঁতের শাড়ীটায় জড়িয়ে বকুলকে পাঁজা কোলে তুলে এনে তার দামী পাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল।

ডাক্তার ডেকেছিল ষোল টাকা ভিজিটের।

এম্বুলেন্স না পেয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল পাড়ার একজনের গাড়ীতে সাত টাকা ভাড়া দিয়ে। ভাড়া হিসাবে নয়, পেট্রলের দাম হিসাবে প্রভাত নির্ব্বিকার চিত্তে সাত টাকা আদায় করেছিল। তবু, তার নামটা বাসন্তী প্রকাশ করে না।

বকুল ঝির জন্য তার শোকটা আন্তরিক। নিজেই আজ সে ঘর ঝাঁট দেয় বাসন মাজে বলে নয়। এ সব সে করছে নিজের খুসীতে রাজীবের আপত্তি উপেক্ষা করে, গায়ের জোরে।

রাজীব বলে, একটা ঠিকে ঝি রাখতে পারি না ভেবেছ না কি?

বাসন্তী বলে, তুমি আর কথা ক'য়ো না। পার্টনার যাকে

বোকা পেয়ে পথে বসায় তার মুখে আবার কথা! নবাবী যখন করতে হয় আমিই করব, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। বুঝলে?

লোলুপ চোখে রাজীব তাকে দেখে। এক যুগ ধরে তার প্রেমে ভাঁটা পড়ল না, দিন দিন যেন নেশার মতই চড়ছে।

মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে বাঁকা চোখে বাসন্তী তাকিয়ে নেয়।

ঃ ঠিকে ঝিদের ঝাঁটা মারি। যেদিন পারব আবার বকুলকে রাখব।

লোকের বাড়ী ঝি আসে, ঝি চলে যায়—আগে বাসন্তী বুঝতে পারত না এ ব্যাপারের মানে। এখন খানিকটা টের পেয়েছে, বকুলকে ছাড়িয়ে দেবার পর।

ঝি পুরাণো হওয়া আজকাল অসাধারণ ব্যাপার। পুরাণো দিনের মত আদর দিয়ে আপন করে সে ঠিকে ঝি বকুলকে এত বছরের পুরাণো করেছে, কিন্তু সেটা আজ কজন পারে? সে নিজেও আজ পারছে না।

গিন্নিদের আর ঝিদের মধ্যে শুধু পয়সা আর খাটুনি লেনদেনের চাঁছাছোলা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। দোষ কোন পক্ষেরই নয়। নিজেদেরি জোটে না গিন্নিদের, তিন বাড়ী খেটে ঝিদের ভরে না পেট।

সাধনাকে সে বলে, তাই বটে ভাই। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট। ঝিরা টিঁকবে কিসে? ছাঁকা মাইনে, বাঁধা ধরা ছাঁকা কাজ, দু'টো মিষ্টি কথা পায় না। ঝিকে মিষ্টি

কথা মানুষ বলবেই বা কোন ভরসায়? আজ এটা কাল ওটা চেয়ে বসবে—দেবার সাধ্যি কই? ছাঁকা মাইনে দিয়ে রাখতে পারলে আমি কি বকুলকে ছাড়াই! না চাইতে এটা ওটা কত কি পেয়েছে, দুটো একটা টাকা যখন তখন চেয়ে নিয়েছে, মাইনে থেকে কখনো কাটি নি। আজ কোন মুখে শুধু মাইনেটা ধরে দেব?

যা বোঝে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বাসন্তী, যেটুকু বোঝে সহজভাবে সোজাসুজি বোঝে। তার এই সহজ বাস্তববোধ মাঝে মাঝে বিচলিত করে দেয় সাধনাকে।

অভাবে তারও স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। চাকুরে স্বামীর সঙ্গে যে উগ্র ব্যবহার কল্পনাতেও আনতে পারত না, স্বামীটি বেকার হতেই তার চেয়ে বেশী উগ্রচণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অভাব আশাকে করে দিয়েছে ঠিক তার বিপরীত—নির্জীব নির্বাক মূর্তিমতী হতাশার মত।

অথচ কত সহজভাবে বাসন্তী মেনে নিয়েছে অভাবকে!

কত অনায়াসে বাতিল করে দিয়েছে আগের দিনের জের, অতীত সুখের জাবর কেটে দুঃখ দুর্দ্দশাকে আরও বেশী অসহ্য করা। সেই বাসন্তী বিশেষ কাবু না হয়েই রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে—মেয়েকে রাখে; রাণীর মত যার আলস্য উপভোগের ঢং দেখে সেদিনও গা জ্বলে গিয়েছে সাধনার!

কিন্তু কেন? কেন বাসন্তীর পক্ষে এটা সম্ভব হল? সে যা পারে নি, আশা যা পারছে না, বাসন্তী কেন তা পারবে?

এ প্রশ্নের জবাব সাধনা পায়। বাসন্তীর কাছেই পায়।

কিছুদিন পরে বাসন্তীর চোখে মুখে সে দেখতে পায় ক্লেশের ছাপ, ক্লান্তির চিহ্ন। তার পরিপুষ্ট সর্ব্বাঙ্গের অত্যধিক লাবণ্য ধীরে ধীরে খরচ হয়ে যাচ্ছে টের পাওয়া যায়।

এই তবে আসল মানে বাসন্তীর এত সহজে এত অনায়াসে দুঃখকে বরণ করার? জীবনীশক্তি সে সঞ্চয় করেছিল অনেক, তার বা আশার যে সুযোগ কোনদিন জোটে নি।

জমানো গয়না জমানো টাকা দিয়ে সে স্বামীকে উদ্ধার করেছে বিপদ থেকে। জমানো স্বাস্থ্য আর অনাহত আনন্দ ভরা মন নিয়ে নেমেছে অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে।

তাজা দেহ তাজা মনকে ক্ষয় করার সুযোগ পেয়ে বাসন্তী সতেজে খাড়া থাকতে পেরেছে। তাদের মত আগে থেকেই ওর দেহ আর মনের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় নি।

তাই বটে। ঠিক।

ওই গরম সহ্য হওয়া আর অসহ্য হওয়ার মত একই ব্যাপার। জীবনীশক্তি বজায় থাকলে গ্রীষ্মও যেমন সয়, দুঃখও তেমনি সহজে কাবু করতে পারে না মানুষকে। বাসন্তী মোটা সোটা মানুষ, গরমে তবু তাদের চেয়ে তার কষ্ট হয়েছে কম।

অভাব তাকে কাবু করতে পারছে না এখনও।

দু'জনের অতীত জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনে মনে সাধনা থ' বনে থাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে আগে

নয়, রাখালের চাকরী যাবার পর সম্প্রতি তারা দুঃখের স্বাদ পেয়েছে। আগে না কি তারা সুখে ছিল। আজ এমনই চরম দুরবস্থা যে তুলনার ফাঁকিতে এই পরম মিথ্যাটাও সত্যের মত মনে হয়।

অভাব ছিল না কবে? কেরাণীর মেয়ে কেরাণীর বৌ সে আর তার মত অন্য সকলে কবে জেনেছে প্রাচুর্য্যের স্বাদ, কবে মুক্ত থেকেছে আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আবহাওয়া থেকে? কোন মতে বেঁচে থাকাটাই চিরদিনের অভ্যাস, দেহ মনের সর্ব্বাঙ্গীন ঘাঁটতিই চিরন্তন প্রথা—অবনতি হতে হতে চাকরী গিয়ে রাখাল বেকার হয়ে পড়ামাত্র একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হওয়ায় মনে হত সুদিনই ছিল বুঝি আগেকার কোনমতে টিকে থাকার দিনগুলিও!

বাসন্তী এতকাল এড়িয়ে এসেছে এই অপূর্ণতার চাপ। পিছিয়ে সে আছে অনেক দিক দিয়ে, যে সব বিশ্বাস ধারণা সংস্কারকে বাতিল করে দিয়ে তাদের মত মানুষেরাও এগিয়ে গেছে এখনো সে সবের গুদাম হয়ে আছে তার মনটা, কিন্তু জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির অভাব সে জানে নি, পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন সংঘাত বাধে নি তার পিছিয়ে পড়া জীবনের।

এই পর্য্যন্তই ভাবতে পারে সাধনা। বাসন্তীর সঙ্গে নিজের এই এক পেশে অসম্পূর্ণ তুলনা তাকে উন্মনা করে দেয়, ঈর্ষা মেশানো বিষাদ আর নৈরাশ্য জাগায়।

এত দাম জীবনে প্রাথমিক মোটা প্রয়োজনগুলির?

জীবনকে রসালো আনন্দময় করার জন্য এত জরুরী এই ভিত্তি শক্ত করে গাঁথা ?

অনভ্যস্ত টানাটানি আর অবিশ্রান্ত খাটুনি যেন রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর নতুন এক ধরণের প্রণয়লীলা ! তাদের স্থূল অমার্জিত ঘন গাঢ় রসালো প্রণয়ের যেন নতুন একটা পর্য্যায় আরম্ভ হয়েছে অভাবের দিন সুরু হওয়ার সঙ্গে। বিলাসব্যসন ত্যাগ করে রান্না করা বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়ায় মেতে গিয়ে রাজীবকে যেন আবার নতুন করে জমিয়েছে বাসন্তী।

দু'জনের হাবভাব কাবু করে দেয় সাধনাকে !

মুখে শ্রান্তির ছাপ পড়েছে বাসন্তীর কিন্তু রসে আহ্লাদে প্রাণটা যেন তার থৈ থৈ করছে !

তার কাছে গোপন করে না বাসন্তী। নালিশ জানায়। মনের মানুষের সোহাগের বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে সখির কাছে দম নেবার অবসরটুকুতে থমথমে আনন্দের ভঙ্গিতে নালিশ করে।

: বুড়ো বয়সে এমন করে পিছনে লেগে থাকে ভাই ! কষ্ট করছি দেখে সোহাগ বাড়িয়েছেন। জ্বালাতন হয়ে গেলাম।

: জ্বালাতন বৈ কি !

ঈর্ষা থেকে আসে আত্মগ্লানি। স্থূল অমার্জিত জীবন ? ওদের সারা বাড়ী খুঁজে রামায়ণ মহাভারত আর দু'একখানা সতীর অমুখ সতীর তমুক ছাড়া বই মেলে না একখানা ? চিঠি লিখতে বসলে কলম ভাঙ্গার উপক্রম হয় বাসন্তীর ?

কি এসে গিয়েছে তাতে ওদের।

আর কি লাভ হয়েছে তাদের বই মাসিক পত্র খবরের কাগজ পড়ার সাধ আর চিন্তা করার সাধ্য থেকে, কিঞ্চিৎ সভ্যতা ভব্যতা আর মার্জিত রুচি থেকে!

অভাব অনটন পর্য্যন্ত ওরা তলিয়ে দিয়েছে স্থূল আনন্দ আর উন্মাদনায়।

আর অভাব মিটে গেলেও তাদের জীবন হয়ে আছে নিরানন্দ প্রাণহীন একঘেয়ে দিন কাটানো।

বাস্তব দুঃখের সঙ্গে সখির এই অবাস্তব বাক চাতুরী আর ছেলেখেলা কোথায় ভাবিয়ে তুলবে সাধনাকে, তার বদলে তার জাগে ঈর্ষা আর খেদ।

বহুকাল ধরে দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে তারা কি হয়েছে আর সন্থ সন্থ দুঃখের সঙ্গে পরিচয় সুরু হওয়ায় বাসন্তীরা কি হয়েছে—তারই মধ্যে সে করছে তুলনা!

দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়েও সে যে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম করেছিল রাখালের বেকারত্বের ধাক্কায়, সে অভিজ্ঞতা না নিয়েই যে বাসন্তীকে সুরু করতে হয়েছে দুর্দ্দিনের যাত্রা এটা খুব সরল সহজ বাস্তব হিসাব।

কিন্তু এটা মনেও আসে না সাধনার।

সে ভাবে না যে সঞ্চিত বাড়তি শক্তি তো বাসন্তীর শেষ হয়ে যাবে দুদিনেই, কিসের জোরে তখন সে বইবে অনভ্যস্ত দুর্দ্দশার বোঝা?

ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি দাই-গিরি করেও বঞ্চিত সঙ্কুচিত

অপূর্ণ জীবনকে প্রেম দিয়ে রস দিয়ে কাব্য দিয়ে আনন্দময় করার চিরন্তন উপদেশটাই হাতে নাতে সবে পালন করতে স্বরু করেছে বাসন্তী। কদিন আর লাগবে ফাঁকিটা প্রকট হতে?

ইতিমধ্যে বাসন্তীদের নীচের তলায় একদিন ভাড়াটের আবির্ভাব ঘটে—প্রৌঢ় বয়সী চরণ দাস। হরেকৃষ্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ করে। তার স্ত্রী রাধা কালো এবং রোগা, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। সঙ্গে আসে রাধার বিধবা বুড়ী মা আর আঠার উনিশ বছরের ভাই গৌর। সেও ওই কারখানায় ঢুকেছে চরণের চেষ্টায়।

নীচের তলাটা যেন হঠাৎ মানুষে আর কলরবে ভরে যায়। দু'খানা ঘরে এতগুলি মানুষ!

বাসন্তী কল্পনাও করতে পারে না।

বাড়ীভাড়া প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগ কমিয়ে দেবার জন্য বাসন্তীই উৎসাহী হয়ে তার সংসারটা গুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেড়খানা ঘর আর খোলা ছাতটুকুতে।

ভাড়াটে বাহিনী দেখে তার সত্যি সত্যি রাগের সীমা থাকে না।

: তোমার এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? আর তুমি ভাড়াটে পেলে না?

রাজীব ভড়কে গিয়ে বলে, কেন, কি হল? কোন হাঙ্গামা করেছে নাকি, বজ্জাতি?

: ওরা এতগুলি লোক আমায় জানালে না কেন?

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আমি কি জানতাম?

বন্ধু একে জুটিয়ে দিলে, বললে যে লোক খুব ভাল, কোনরকম গোলমাল করবে না। চরণ বাবুকে শুধিয়েছিলাম ওরা লোক কজন, কি বিত্তান্ত। তা আমায় বললে যে স্বামীস্ত্রী আর কটি ছেলেপিলে।

বাসন্তী ঝংকার দিয়ে বলে, তবে তো খুব ভাল লোক, গোড়াতেই মিছে কথা বলেছে। যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও জোটে তেমনি।

: তা, ওরা লোক বেশী তো আমাদের কি এমন অসুবিধে ?

: আহা মরি, যা বলেছ! নীচের তলায় হাট বসালে, আমাদের কি অসুবিধে! আমি থাকব না এখানে, তুমি অন্য বাড়ী খোঁজ কর।

অনেকদিন বাদে আজ রেগেছে বাসন্তী, রাগ করে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলেছে।

কোঁদল করা নয়। আগের মত কোঁদল করতে বোধ হয় ভুলেই গেছে বাসন্তী। তবু তার কাছে একটা মুখ ঝামটা পেয়ে রাজীবের খুসীর সীমা থাকে না।

খুসী হয়ে করে কি, এই সকাল বেলাই বাসন্তীর স্থায়ী কড়া হুকুম অগ্রাহ্য করে বাজার থেকে প্রায় সোনার মতই দুর্মূল্য আস্ত একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আসে।

খুসী হলে হোক। নইলে এই নিয়ে ঝগড়া করুক। রাজীবের মনটা ছটফট করছে বাসন্তীর কোঁদলের স্বাদ পাওয়ার জন্য।

মাছ দেখে বাসন্তী মুখ বাঁকিয়ে আড় চোখে তাকায়। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে।

রাজীব কৃতার্থ হয়ে যায়।

ঃ ঘুষ দিচ্ছ? এতবড় মাছটা যে আনলে, কে খাবে? তিনবেলা করব আমি—কাল বাসি মাছ খাওয়াবো।

ঃ মাছ খাওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি তোমার?

ঃ সেই হিসাব ধরেছ? একা একা ভাল জিনিষ খেতে বিশ্রী লাগে?

ঃ লাগে না?

ঃ আজকাল আর বিশ্রী লাগে না গো, লাগে না। নিজের জোটে না, পরকে দেব!

মাছ দেখে হেসে ফেলে রাজীবকে কৃতার্থ করেছিল বাসন্তী, হাল্‌কা সুরে হলেও শেষ কথাটা বলে সেই আবার তাকে আহত করে।

বাসন্তীর মুখে অভাবের উল্লেখ শুনলেই তার আঘাত লাগে না—এভাবে বলা হলে লাগে!

একটু ম্লান গম্ভীর মুখেই সে দোকানে যায় সেদিন।

দেখে বাসন্তীরও মনটা যায় খারাপ হয়ে।

ধীরে ধীরে সে নীচে নামে।

তফাৎ থেকে দেখেই নিজের বাড়ীতে মানুষের যে ভিড়টা তার অসহ্য ঠেকেছে, সেই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সে দেখবে সইয়ে নেওয়া যায় কিনা।

ঘর গুছানো আর রান্নাবান্না নিয়ে তারা ব্যস্ত। তখনো

ঘরে অনেক জিনিষ এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে, রাধা আর তার বড় মেয়ে প্রণতি কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগেছে সেই বিশৃঙ্খলার পিছনে।

মালপত্রের মতই এলো-মেলো ভাবে দাঁড়িয়ে বসে ছড়িয়ে আছে ছয়টি ছেলেমেয়ে—বড়টির বয়স দশ এগারর বেশী নয়।

প্রণতির বয়স পনের ষোল হবে।

ঃ ঘর গুছোচ্ছেন ?

ঃ হ্যাঁ, দেখুন না চেয়ে, কি ঝন্‌ঝাট ! দিব্যি ছিলাম, কি যে পোকা ঢুকল মাথায়। নিজের বাড়ী ভাড়া দিয়ে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। কোথায় রাখি এখন এত জিনিষ ?

সেটা মিছে নয়। তাকালেই বোঝা যায় জিনিষপত্রগুলি শুধু চরণদাসের একার জীবনে সঞ্চয় করা নয়, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে জমছে। জীর্ণ পুরাণো একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য কত জঞ্জালও যে আছে। ফেলতে বোধ হয় মায়া হয়।

ঃ আপনাদের নিজেদের বাড়ী ছিল নাকি ?

ঃ তবে না তো কি ? কত বললাম, একখানা ঘর অন্তত নিজেদের জন্য রাখো, তাতে বাড়তি জিনিষপত্র থাকবে। তা নয়, সবটা বাড়ী ভাড়া দিয়ে দিলেন।

কোলের ছেলেটি দোলায় ঘুমোচ্ছিল। দোলা টাঙ্গানো হয়েছে সর্বাগ্রে। এমন আচমকা চীৎকার করে ছেলেটা কেঁদে ওঠে যে বাসন্তী চমকে ওঠে।

ঃ কি হল ?

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে মুখে মাই গুঁজে দিয়ে রাধা বলে, কিছু হয় নি।

বসতে বলে না কেন কে জানে! বোধ হয় ভেবেছে, এক বাড়ীতে থাকে, দরকার হলে নিজেই বসবে! ছোটখাটো রোগা কালো মা-টির জন্য বাসন্তী মায়া বোধ করে, কিন্তু ছেলেমেয়ের পালটি দেখে তার অস্বস্তিরও সীমা থাকে না। দিনরাত এরা হট্টগোল করবে—এইটুকু বাচ্চাটার পর্যন্ত কি গলা ফাটানো কান্না!

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না বাসন্তী।

৫

বাসন্তীও মাঝে মাঝে সাধনার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরোয়।

নীচের তলার হৈ হৈ কিচির মিচির ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি তার সহ্য হয় না। বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মাঝে মাঝে সে তার সহজ বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাধনার মনের নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার সূত্র ধরিয়ে দেয়।

মল্লিকদের শোভার বিয়ে না হওয়ার রহস্য সে জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দেয় সাধনাকে।

মল্লিকদের বাড়ী লোক অনেক। অনেক লোক মানেই অনেক হাঙ্গামা, অনেক কাজ। বাড়ীর মেয়েরা সারাদিন ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে থাকে, অবিশ্রাম খাটে।

বুড়ো রাজেন মল্লিক পেনসন পায়। দুই ছেলে চাকরী করে, এক ছেলে ডাক্তারি পড়ে, এক ছেলে বখামি করে ঘুরে বেড়ায়, আরেক ছেলে পড়ে স্কুলে। শোভার বড় বোনের বড় ছেলেটিও এখানে খরচ দিয়ে থেকে কলেজে পড়ে, তার বাবা মফঃস্বলের সহরের ডাক্তার। বড় ছেলের পাঁচটি ছেলে মেয়ে, মেজ ছেলের দুটি এবং আরেকটি শীগগির হবে। এ ছাড়াও থুড়থুড়ে একজন বুড়ী থাকে বাড়ীতে, শোভার সে পিসীমা, রাজেনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

তা ছাড়াও মাঝে মাঝে আত্মীয় কুটুম্ব আসে।

তবে দু'চারদিনের বেশী থাকে না। যারা আসে তারা নিজেরাই এটা ভাল করে বোঝে যে আজকের দিনে এর চেয়ে বেশী চাপ দিতে গেলে সহ্য হবে না, আত্মীয়তা কুটুম্বিতার বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।

বড় মেয়ে মেজ মেয়ে মাঝে মধ্যে দু'একমাস থেকে যায়, খরচ দিয়ে। বড় জামাই ডাক্তার, মেজ জামাই মোটামুটি ভালই চাকরী করে।

ছেলেদের চাকরী বাকরী পড়াশুনা সবই সহরে। দেশের সম্পত্তি বেচে দিয়ে রাজেন এই ছোটখাট বাড়ীটা কিনেছিল। বাড়ীটা রাজেনের, শুধু এই একটি সূত্রে বাঁধা হয়ে এতগুলি প্রাণীর জীবনযাত্রা এখানে একত্র হয়ে আছে।

মোটামুটি মিলে মিশেই আছে। ঝগড়াঝাঁটি যা হয় তার চেহারা এখনো পারিবারিকই বটে। বড় স্বার্থের সংঘাত ঘটবার কারণ এখনো ঘটে নি।

রাজেন পেনসন পায়, বাড়ীটাও তারই।

কিন্তু ভাঙ্গন ঠেকাবে কে? কাল যা ভেঙ্গে দিতে চায়? ভাঙ্গনের পোকা কুরে কুরে ক্ষয় করেছে ভিতরে ভিতরে, তলায় তলায়। নজর করলে বাইরে চোখে পড়ে এই ধরণের পারিবারিক প্রাচীনতা আর জীর্ণতা। অন্ধ বিশ্বাসী তবু আশা করে, হয় তো আরও অনেক কাল টিকে যাবে!

স্কুল কলেজ আপিস, বুড়ো বুড়ি কাচ্চাবাচ্চা, অসুখ বিসুখ পূজা পার্বন—এলোমেলো বিশৃঙ্খল সংসার যাত্রায় কোনরকমে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত করতে হয় মেয়েদের। অবশ্য যার যতখানি করণীয় এবং যে যতখানি না করে পারে তারই হিসাবে।

রান্না করা বাসন মাজা কাপড় কাচা ছেলে ধরা সেলাই করা—নানা কাজে শুধু হাত লাগাতেই হয় না শোভাকে, নানা কাজ সম্পন্ন হওয়ার দায়িত্বও তাকে নিতে হয়।

সেই তো শুধু ঝাড়া হাত পা এ বাড়ীতে, যোয়ান বয়সী সুস্থ সমর্থ মেয়ে। শোভাও মনে করে না তাকে বেশী রকম খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যায় ভার চাপানো হয়েছে তার ঘাড়ে। নিজেদের বাড়ীতে যতটা পারে খাটবে না মেয়েছেলে, চালু রাখবে না সংসার?

অনাদর অবহেলা নেই। ডাল তরকারী যদি কম পড়ে যায়, হাঁড়িতে ভাতে টান পড়ে, সেটা শুধু তার একার বেলা নয়, কারো ইচ্ছাকৃত নয়। যে দিনকাল, যে ব্যবস্থা রেশনের

আর যে দাম কালোবাজারী চালের, পুরুষ আর ছেলেপিলেদের খাওয়ার পর মেয়েদের বেলা ওরকম কম পড়বেই !

তার পাতেই বরং বেশী ভাত দেবার চেষ্টা হয়, বৌদি ডালের বাটি কাত করে দেয় তারই পাতে।

সবাই যেমন পরে সেও তেমনি পরে সেলাই করা কাপড়। বৌদিদের চেয়ে বরং তার কাপড়টাই আসে আগে, না চাইতে তার জামার ছিট কিনে আনে ভায়েরা।

শোভার কেন বিয়ে হয় না আবিষ্কারের চেষ্টায় এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাধনা পরিবারটিকে পরীক্ষা করেছে।

বাসন্তী বলে, ওমা, তা আনবে না? মায়ের পেটের বোন, বাপ বেঁচে রয়েছে, ছেলেপিলের জামার ছিট এনে সেলাই করিয়ে নেবে শুধু?

তাই বটে। ছিট শুধু শোভার একার জন্য আসে নি, শুধু নিজের জামাটিই সে সেলাই করবে না !

চা করে বড় বৌ নিজে এনে দেয় ননদকে।

শুনে বাসন্তী বলে, ওমা, তা দেবে না? একলা নিজে কটাকে সামলাবে? ননদ যদি না রোগা ছেলেটার ঝনঝাট পোয়াতো, রাতে ঘুমোতে না পেয়ে মরে যেত না বড় বৌ !

: এই জন্য বাড়ীতে আদর শোভার? সবার জন্য খেটে মরে, সবার দায় সামলায়, তাই তার খাতির? বিনা মাইনেতে এমন প্রাণ দিয়ে খাটবার লোক মিলবে না বলে?

: না না, ছি! খাটতে না পারলে, আলসে কুড়ে হলে কি ফেলে দিত? সবাই হয় তো এতটা সন্তুষ্ট থাকত না,

এইমাত্র। বোন বলেই আদর যত্ন করে, সবার জন্য এত করে বলে আরও খুসী সবাই, এইমাত্র। মেয়েটাও কি ওসব ভেবে খেটে মরে? নিজের বাপ ভায়ের সংসার বলেই খাটে।

মুখে তর্ক করে না সাধনা, মনে মনে বলে, সে তো নিশ্চয়! বাপ ভায়ের সংসার বলে প্রাণের তাগিদে প্রাণপাত করে খাটে বলেই তো তার এত দাম! হাজার টাকা মাইনে দিয়েও তো এমন লোক মিলবে না যে আপন জনের জন্য করছি জেনে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে করবে!

কিন্তু তাই বলে বাপ মেয়ের, ভায়েরা বোনের, বিয়ে না দিয়ে আইবুড়ো করে ঘরে রেখে দেবে নিজেদের স্বার্থে?

: বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ী গেলে সবাই মুস্কিলে পড়বে, তাই বুঝি বিয়ে দেবার গরজ নেই?

বাসন্তী হেসে ফেলে, ধেৎ, কি যে সব অদ্ভুত কথা তোমার মনে আসে ভাই! বাপ ভাই কখনো তা করতে পারে? বিয়ে দিতে পারলে বরং দায় চুকবে, হাঁপ ছাড়বে!

: তবে?

: সুবিধামত পাত্র পায় না, এই আর কি। যা দিন কাল! তা ছাড়া, শুধু খাটতেই পারে মেয়েটা, আর কি আছে যে ভাল ছেলের পছন্দ হবে? ওদের এখন উঁচু নজর— এদিকে মেয়ের যে চেহারাও নেই, লেখাপড়া গানবাজনাও শেখায় নি, সেটা খেয়াল রাখে না!

যে দিনকাল! ওরা যেমন পাত্র চায় সেরকম পাত্রের পছন্দসই পাত্রী নয় শোভা।

শোভার সেজ বোন প্রভা ক'দিন হয় বাপের বাড়ী এসেছে। তার স্বামী রামনাথও এসেছে সঙ্গে।

মল্লিকদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে আজ সাধনা বিশেষভাবে আলাপ করে রামনাথের সঙ্গে, ভালভাবে লক্ষ্য করে প্রভার হাল চাল। এমন কিছু অসাধারণ সুপাত্র নয় রামনাথ, মানানসই বয়স, মোটামুটি চেহারা ও স্বাস্থ্য, মোটামুটি ভাল কাজ করে। শোভার চেয়ে প্রভাও এমন কিছু বেশী লেখাপড়া গানবাজনা শেখে নি, দেখতেও সে বোনের তুলনায় এমন কিছু রূপসী নয়। রামনাথ নিজেই তাকে দেখে পছন্দ করেছিল—দশ বছর আগে দাবীদাওয়াও তাদের পক্ষে ছিল সাধারণ।

আজ রামনাথের মত পাত্র অনেক বেশী দুর্মূল্য! শোভার মত মেয়েকে আজ যদি আরেকজন রামনাথ বিয়ে করেও, অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে তাদের বর্দ্ধিত মূল্য!

শুধু বেকার বেড়েছে বলে নয়, যত উপার্জন হলে বুক ঠুকে বিয়ে একটা করে ফেলা যায় সেটা আকাশে চড়ে গিয়েছে বলে, খাদ্য বস্ত্রের মতই ঘাঁটতি দেখা দিয়েছে সাধারণ যোগ্য পাত্রের!

তাই এসেছে এই উদাসীনতা। যেমন চায় তেমন বিয়ে দেবার সাধ্যও তাদের নেই।

চোখকান বুজে যেমন তেমন একজনের হাতে সঁপে দেওয়া যায় শোভাকে। আগের দিনে দরকার হলে তাই দিত। এই

আশা থাকত যে যতই খারাপ হোক বিয়ে, যত সামান্যই জুটুক যে জন্য বিয়ে দেওয়া জীবনের সেই সার্থকতা—বাপের বাড়ী আইবুড়ো হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে সে অনেক ভাল। বর বুড়ো হোক, সেদিক থেকে ব্যর্থ হোক মেয়ের জীবন, খেয়ে পরে সংসারে গিন্নি হয়ে দিন কাটাবার সুখটা সে পাবে। অথবা যোয়ান বয়সী অকেজো অপদার্থ হোক বর—তার বাপ দাদা ভাল ঘরের মানুষ, তারা স্বামীর দিকটি ছাড়া অন্যদিকে সুখে রাখাবার চেষ্টা করবে মেয়েকে।

আজ আর এসব ভরসা নেই। ভাল বর ছাড়া কোনদিকে আশা করার কিছু নেই যে বাপের বাড়ী কুমারী হয়ে পড়ে থাকার দুর্দ্দশার চেয়ে বিয়ে দিলে অন্ততঃ সামান্য একটু ভাল হবে মেয়ের জীবনটা?

প্রভার সঙ্গে কথা কইতে কইতে শোভার উপর বাড়ীর মানুষের নির্ভরতা লক্ষ্য করে মনে মনে সাধনা সায় দেয়। দশটা ঝি দশটা রাঁধুনি দশটা দাই-এর মতই তাকে ছাড়া গতি নেই এ বাড়ীর ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের—এর চেয়ে আর কি চরম ব্যর্থতা কল্পনা করা যায় একটি বিকাশোন্মুখ নারী জীবনের!

কিন্তু এর চেয়েও বীভৎস ভয়ানক ব্যর্থতা সহজেই কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে এদেশে। গায়ের জোরে ঋষির মন্ত্রের অচ্ছেদ্য বাঁধনে চিরকালের জন্য বেঁধে ওকে যে কোন একটা পুরুষের দাসী করে দিলে ওই নতুন তাঁতের শাড়ীটি হয় তো আর ওর গায়ে উঠবে না, মাছের টুকরো না পেলেও ঝোল

আর আলুর টুকরো দিয়ে পেট ভরে যে ভাত খেয়েছিল ওবেলা তার বদলে নুন ভাত না পেয়ে উপোস করেই দিন কাটবে।

ও শোভা!—সাধনা ধৈর্য্য হারিয়ে ডাকে,—বাড়ীতে একটা লোক এলে বুঝি ফিরে তাকাতেও নেই?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের ডাক শোনা যায়, শোভা? আমার ওষুধটা দিয়ে গেলি না মা?

এবং অন্যদিক থেকে বড় বৌ বরদার সকাতর আহ্বান আসে, ও ঠাকুরঝি? দুধ বার্লিটা এনে দাও? একেবারে খেয়ে ফেলল যে আমায়?

খলে পুতা দিয়ে বাপের ওষুধটা মাড়তে মাড়তে শোভা কাছে এসে দাঁড়ায়। নীরবে মাথা নেড়ে একবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে বাপের ডাক এসেছে, আরেকবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে এসেছে বরদার সকাতর আবেদনের হুকুম। ক্লিষ্টক্লান্ত স্বরে বলে, কেমন আছেন?

বিয়ে হলে চুলোয় যেত, প্রত্যক্ষ মরণের জ্বলন্ত আগুনে। বিয়ের নামে সঁপে না দিয়ে বাপ দাদা তাকে ভাজা ভাজা করছে বাপ দাদার উপর নির্ভরশীল তেইশ চব্বিশ বছরের কুমারীত্বের তপ্ত তেলে।

: শোভা? ওষুধ খাবার সময় যে পেরিয়ে গেল মা!

: ঠাকুরঝি, দুটোতে মিলে যে চেঁচাচ্ছে ভাই!

শোভা চেঁচিয়ে বলে, আসছি।

সেটা দুদিকেরই জবাব হয়।

দাঁড়িয়ে থেকে শোভা বলে, দেখছেন তো, খেটে খেটে সময় পাই না। আপনাদের বাড়ী যাব ভাবি, হয়ে ওঠে না।

ঃ দেখছি বই কি বোন? পাঁচদশটা স্বামী আর বিশ পঁচিশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিরাট সংসার চালাচ্ছ।

প্রভা মুখে একটা পাণ পুরে দিয়ে বলে, ওকে আমি এক মাসের জন্য নিয়ে যাব। খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে কালি মারিয়ে দিয়েছে চেহারায়। যেমন বুদ্ধি হয়েছে বাবার, তেমনি স্বার্থপর হয়েছে দাদা। বিয়ের যুগ্যি মেয়েটাকে কোথায় একটু ভাল খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে রেখে সুশ্রী করবে, ঝিয়ের মত চেহারা করিয়েছে।

রামনাথ সিগারেট ধরিয়ে বলে, সুধীর বাবুর ছেলেটার সঙ্গে জুটিয়ে দিতে বলেছিলে তুমি—

ঃ চুপ কর তুমি।

ঠিক কথা। শোভার সামনে সত্যই বলা উচিত নয় যে কোন এক বাবুর কোন এক ছেলের সঙ্গে তাকে জুটিয়ে দেবার কথা তারা ভেবেচিন্তে পরামর্শ করে এসেছে!

মনে তার আশা জাগবে, নানা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে! তারপর যদি কোন কারণে বিয়েটা না হয়?

ছেলেকে বাড়ীতে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিল, আশার জিম্মায়। এমন সে প্রায়ই রেখে যায় আজকাল। আশা আপত্তি করে না, বিরক্ত হয় না। তার নিজের ছেলেপিলের ঝনঝাট নেই,

বাড়ী থেকে এক রকম বেরোয় না, সাধনার ছেলেটাকে একটু দেখলে দোষ কি ?

বরং ভালই লাগে ছেলেটিকে নিয়ে থাকাতে। মনটা একটু অন্যদিকে যায়।

কি পরিবর্তনটাই ঘটে মানুষের! কি অদ্ভুতভাবেই উল্টে যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক! চব্বিশঘণ্টা এক বাড়ীতে থেকেও যার সঙ্গে কথা কইতে বিরক্তি বোধ হত, যেচে আলাপ করতে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালে আয়নায় যাকে দেখেও মুখ ফিরিয়ে তাকাত না, আজ সে খুসী হয়েই তার ছেলেকে পাহারা দেয় তাকে একটু নির্ব্বিবাদে পাড়া বেড়াবার সুযোগ দিতে!

এমন বিশেষ কোন উপকার সাধনা তার করে নি যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে, কোন প্রত্যাশাও রাখে না তাদের কাছে। সাধনাদের দিক থেকে এই প্রত্যাশার ভয়েই কিছুদিন আগে আরও বেশী করে সে ওদের এড়িয়ে চলত!

আজ উল্টে গেছে অবস্থা। আশা টের পেয়েছে, তাদের মত মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আর দরিদ্রকে এড়িয়ে চলা যায় না। একটা জেল তৈরী করে নিজেকে সেখানে কয়েদ করতে হয়।

সাধনার সঙ্গে সে প্রাণ খুলে সোজাসুজি এসব কথাও বলে। তাদের আগের দিনের সম্পর্কের কথা।

সে বলে, গরীবরাই বরং ফাঁকতালে চায় না, হাত পাতে না। এদেশে তাহলে ভিখিরিই গিজ গিজ করত। তোমার

দুর্দ্দশা দেখে সত্যি কষ্ট হত ভাই, বিশ্বাস করবে ? কিন্তু ভাবতাম, নরম দেখলেই আজ এটা চাইবে কাল ওটা চাইবে, হঠাৎ এসে বলবে বড় বিপদে পড়েছি, কটা টাকা দাও। তুমি চাইতে না বলে আবার রাগও হত !

সাধনার মুখে হাসি ফোটে।

: ওসব টের পেতাম। কখন কি চুরি করি এ ভয়টাও তোমার ছিল।

এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে থেকে আশা জোর দিয়ে বলে, মিছে বলব কেন ? সত্যি সে ভয় ছিল। রাজার হস্ত করে সমস্ত গরীবের ধন চুরি—কবিতাটা মুখস্তই করেছিলাম ছেলেবেলা, সত্যিকারের চোর কারা চিনি নি। ভাবতাম যার নেই, সেই বুঝি চুরি করে দায়ে ঠেকে !

এত খোলাখুলি কথা কয়, কিন্তু আশার মনের নাগাল যেন পায় না সাধনা। ভেতরটা যেন তার আড়ালেই থেকে যায়। বোঝা যায় ভেতরে তার তোলপাড় চলছে দুঃখ আর বিষাদের—কিন্তু তার রকমটা যেন রহস্যময়।

আশা নিজে থেকে কথা কয় কম। সাধনা তাকে কথা বলায়।

আশা হতাশায় ঝিমিয়ে গেছে, প্রাণপণ চেষ্টায় খাড়া রাখছে নিজেকে, কিন্তু সেটাই কি সব ? ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার হয়ে যায়নি তার। সঞ্জীব চাকরী করছে, দেনা শোধ করে দায়মুক্ত হতে যতদিনই লাগুক একদিন তার আগের অবস্থা ফিরে আসবে। চিরদিন সে কষ্ট পাবে না !

এমনভাবে কেন তবে মুষড়ে গেছে আশা ?

কষ্ট সইতে পারে না, সেজন্য ঝিমিয়ে যাক, বিমর্ষ হয়ে থাক, কখনো ভুলেও কি হাসতে নেই, দু'দণ্ডের জন্য সজীব হতে নেই ভবিষ্যত সুখের দিনের কথা ভেবে ?

সাধনা বলে, আমাদের সত্যি মনের জোর বড় কম।

ঃ কে বললে ?

ঃ দুঃখ কষ্ট পেলেই আমরা দমে যাই। সুখের দিনও যে আবার আসবে সেটা ভাবি না।

ঃ আসবে ভাবলেই কি দুঃখ ঘুচে সুখের দিন আসে মানুষের ?

ঃ ভাবলেই আসেনা তা ঠিক। কিন্তু একদিন তো আসবেই ? দুঃখ তো চিরস্থায়ী নয় ?

ঃ নয় ? এদেশে কত লোক দুঃখে জন্মে দুঃখেই মরে তুমি জানো ?

সাধনা একটু বিপাকে পড়ে ভাবে, এর মনটা তো বড়ই বাঁকা! কাদের সুখ দুঃখের কথা বলছি নিশ্চয় বুঝেছে, অথচ না বুঝার ভাণ করে টেনে আনল দেশের লোকের কথা !

তবে সেও একটু সাধারণভাবে ভাসাভাসাভাবে কথাটা তুলেছে বৈকি ! যেন সাধারণ সমস্ত মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা বলছে।

সাধনা তাই খানিকক্ষণ একদৃষ্টে দেয়ালে টাঙ্গানো সঞ্জীবের বাঁধানো ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে

বোঝাপড়ার কারবার করতে বেশ চালাক হয়ে উঠেছে সাধনা আজকাল।

ঃ আমাদের সুখ-দুঃখের কথা বলছিলাম। তোমার আমার কথা। মিছিমিছি কেন যে আমরা পর হয়ে থাকি ? প্রাণ খুলে দুটো কথা কইলেও তো প্রাণটা হাল্‌কা হয় ? আমরা একজন কি সিঁদ কেটেছি আরেকজনের সুখের ভাণ্ডারে ?

তখন ভরা দুপুর। বৈশাখী নিদাঘ দুঃখী আশাকে রোজ এসময় খানিকক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখে। তার সুখের ভাণ্ডারে না হোক দুপুরবেলার ঘুমের ভাণ্ডারে সাধনা আজ সিঁদ কেটেছে।

নতমুখে মেঝেতে হাত রেখে বসেছিল আশা। তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে কয়েকফোঁটা জল মেঝেতে ঝরে পড়তে দেখে সাধনা ভাবে,—সেরেছে !

তবে মিছেই সে এতদিন সখিত্ব করেনি বাসন্তীর সঙ্গে। মনে অতি ক্ষীণ একটু দ্বিধার ভাব জাগে মাত্র, তাতে শেষপর্য্যন্ত আটকায় না। এগিয়ে গিয়ে আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছিয়ে দেয় আশার। কিন্তু না বলে একটা মিষ্টি কথা, না দেয় তাকে লজ্জা পাবার সুযোগ।

সেই অহঙ্কারী আশা আজ আচমকা কেঁদে ফেলেছে কিন্তু কিছুই যেন আসে যায় না তাতে।

যে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়েছে সেই আঁচল দিয়েই সে তার ঘাড় আর কণ্ঠার কাছ থেকে ময়লা ঘষে তুলে

আনে। চোখের সামনে ধরে বলে, মেয়েমানুষের গায়ে এত মাটি পড়লে ময়লা জামা কাপড়ের মত তাকেও ধোপা বাড়ী দেয়া উচিত।

চোখ সজল হলেও মুখে হাসি ফোটে আশার।

ঃ ধোপা বাড়ী নয়, হাসপাতাল।

ঃ ওমা, তাই বল।

সাধনা নিজের কান মলে।—ছিঃ আমাকে, একশো ছিঃ। সাধে কি বাসন্তী বলে আমি মেয়েমানুষ নই? এক বাড়ীতে থাকি আমার চোখেও পড়ল না?

আশা চুপ করে থাকে।

যা মনে হত আশার মুখের গোমড়া ভাব, এখন সেটাই সাধনার চোখে ধরা পড়ে তার শ্রান্ত বিষণ্ণ মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা হয়ে।

ঃ ভয় পেয়েছো?

ঃ না।

ঃ ভাবনা হয়েছে?

আশার মুখে আবার একটু ক্ষীণ হাসি ফোটে।

সাধনা বলে, তা ভাবনা হয় নানারকম। কিন্তু তুমি নেতিয়ে পড়েছ কেন ভাই? বাপের বাড়ী ঘুরে এসো না?

আশা বলে, বাপের বাড়ী আমি যাবনা এ অবস্থায়।

সাধনা বুঝতে পারে সে তার কোন অবস্থার কথা বলছে। তার সন্তান সম্ভাবনার অবস্থার কথা নয়। যেতে পারলে ভালই হত বাপের বাড়ী, কিন্তু বাপের দেওয়া একটি গয়না

পর্য্যন্ত তার গায়ে নেই, ভিখারিণীর মত কি করে সে যাবে বাপের বাড়ী ?

আশার কাছে আত্মীয়স্বজন আসে খুব কম। আজ বলে নয়, চিরদিনই এদিক থেকে আশাকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে সাধনার।

ছু'একজন আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় আপনজন আশার কেউ নেই। তার বাপের বাড়ীও পশ্চিমে শ্বশুরবাড়ীও পশ্চিমে।

আপনজনের অভাবটা আজকাল আশা অনুভব করছে।

ঃ মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে! মনে হয় সবাই বুঝি সীতার মত আমায় বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঃ স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছে।

সাধনা হাসে। হাসি কথায় সে আশাকে একটু তাজা রাখতে চেষ্টা করে।

কথা কইতে কইতে কড়া নড়ে বাইরের দরজার। দরজা খুলে সুবেশ সুদর্শন অচেনা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কাকে খুঁজছেন ?

পিছন থেকে আশা বলে, শচীনবাবু! আসুন, ভেতরে আসুন।

সাধনাকে পরিচয় দেয়, ইনি আমার ভগ্নীপতি—মাসতুতো বোনের।

সাধনা নিজের ঘরে যায়, শচীন যায় আশার ঘরে।

বেশীক্ষণ বসে না মানুষটা, মিনিট কুড়ি পরেই বেরিয়ে যায়। সদর দরজা বন্ধ করে আশা এসে বসে সাধনার ঘরে।

তার মুখ দেখে সাধনা ভড়কে যায়।

মানুষটা এসে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন তুলি দিয়ে নতুন কালো বিষাদ আর হতাশা লেপে দিয়ে গিয়েছে আশার মুখে। শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে।

: কি হল ভাই ?

: এবার আমার গলায় দড়ি দেবার পালা।

: গলায় আমাদের দড়ি দেওয়াই আছে। আবার কি হল ?

আশার মুখে এক মর্মান্তিক হাসি ফোটে।—আবার উনি ধার করছেন। আমায় না জানিয়েই করছেন।

: উনি বলে গেলেন বুঝি ?

: হ্যাঁ। ওঁর কাছেও গিয়েছে টাকার জন্য। দু'তিনবার।

সাধনা একটু ভেবে বলে, এক হতে পারে, সঞ্জীববাবু হয় তো ভেবেছেন আত্মীয়ের কাছে টাকা নিয়ে বাইরের দেনাটা সাফ করে দেবেন। আত্মীয়ের কাছে অতটা কড়াকড়ি হবে না, সুদ লাগবে না, ধীরে সুস্থে শোধ করে দেবেন।

আশা ফাঁকা চোখ তুলে তাকায়।

: এরকম কিছু ভাবলে কি আর আমায় না জানিয়ে ভাবত ? সে বুদ্ধি ঘটে থাকলে কি আর এ দশা হয় !

কে জানে এ কি ঝোঁক মানুষের, কোথা থেকে আসে ?

যে পথে প্রতিকার নেই জানে, আরও বিপদ ঘটবে জানে, অন্ধ হয়ে সেই পথেই চলে?

মাস দুই আগে সঞ্জীব এই শচীনের কাছে টাকা ধার করেছিল, আশাকে জানায় নি। গত মাসেও আরেক অজুহাতে কিছু টাকা ধার করেছিল। গতকাল আবার টাকা চাইতে গিয়েছিল, নানা কথা মনে হওয়ায় শচীন আজ তার কাছে এসেছিল ব্যাপারটা বুঝতে।

আশাকে সে শক্ত হতে উপদেশ দিয়েছে। এ নাকি বড় পিছল পথ, গড়িয়ে চলতে সুরু করলে থামা যায় না।

উপদেশ দিয়ে সঞ্জীবের বদলে আশার হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল।

আশা টাকা নেয় নি। বলেছে, যার দরকার তাকে দেবেন। আমার টাকার কোন দরকার নেই।

: পৃথিবীটা যেন কেমন লাগছে ভাই, চিনতে পারছি না। অসম্ভব ব্যাপার সব সম্ভব হচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে বলে? আমি একরকম ভাবি, আসলে দেখি সব উল্টোরকম হয়!

: এতটা হাল ছেড়ে দিও না।

: হাল আছে না কি যে ধরব? আমায় সুখে রাখতে না জানিয়ে দেনা করেছিল, আমার সুখ! গয়ণা দিয়ে জীবন দিয়ে দেনা শুধছি, অসহ্য হলে ভাবছি, আহা, আমার সুখের জন্য মানুষটা পাগল, আমি কষ্ট না করলে কে করবে?

একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে আশার মুখে, আমার কষ্ট দেখেই আবার ধার করছে নিশ্চয়, আমার সুখের জন্য! জানে

তো সামলে ওঠার আগে আমি মরে গেলেও সুখ নেব না. একটু মাছ পর্য্যন্ত আমি আনতে দিই না, টাকাটা অগত্যা নিজের সুখের জন্য খরচ করছে।

সাধনারও নিজেকে বড় নিস্তেজ অসহায় মনে হচ্ছিল। ম্লান মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, চাকরীটা ঠিক আছে তো? না, এই ভাবে—?

ঃ চাকরী ঠিক আছে। ওসব কিছু নয়। আসল ব্যাপার আমি বুঝে গিয়েছি। আমার জন্যে না ছাই, নিজেরি আরাম বিলাস ছাড়া চলে না, কষ্ট সয় না। আগে অজুহাত ছিলাম আমি, এখন আর অজুহাত লাগছে না।

নিজের কপালটা টিপে ধরে আশা।—সে দিন তুটো পাঞ্জাবী করালে। টাকা পেল কোথায়? না, এক বন্ধুর কাছে পাওনা ছিল, শোধ দিয়েছে। একটু ছিঁড়েছিল জামা—রিপু করে সেলাই করে তু'মাস অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু না, তা হয় না, সেলাই করা জামা গায়ে আপিস করা যায় না! একটা করালেই হত একবারে? না, তুটো করালেই সুবিধে—খরচ কম লাগে, বেশীদিন টেঁকে, অমুক হয়, তমুক হয়।

খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে আশা। বলে, তোমায় বলব কি ভাই, ওসব কথা মুখ ফুটে বলতে গেলেও নিজেকে হীন মনে হয়। তুমি তো দেখে আসছ, কি রাঁধি কি খাই? তুমি তো দেখছ, চেহারা কি হয়ে এসেছে? ভেতরে ভেতরে টের পাই শরীরে কত জোর কমেছে।

মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে ওঠে। তোমাদের সঞ্জীববাবুর জন্য এমন ভয় হত গোড়ার দিকে, এই খেয়ে আপিসের খাটুনি খেটে মানুষটা কি বাঁচবে? মাঝে মাঝে জামায় মাংসের ঝোলের দাগ দেখতে পাই। পকেট থেকে সিনেমার টিকিট বেরোয়। দেখে কি স্বস্তিই যে পেতাম। ভাবতাম, ভাগ্যে অনেক বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে হোটেলে খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়। আমি যার দেনা শুধতে ঘরে শুকিয়ে আমসি হচ্ছি, সে ধার করে সিনেমা দেখবে হোটেলে মাংস খাবে —কেউ তা ভাবতে পারে? পারে কেউ?

দু'জনেই চুপ করে থাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবে সাধনা। আশা একটুও কাঁদে না কেন? সব শেষ হয়ে গেছে, কেঁদেও আর লাভ নেই, এ ভাব তো ভাল নয়!

তার ছেলের গালে টোকা দিয়ে আশা আদরের সুরে বলে, দেখি? রাগ হয়েছে, দেখি? মা মেরেছে, রাগ হয়েছে, দেখি?

শিশু মুখের একটা শেখানো ভঙ্গি করলে সে হাসে।

যেন কিছুই হয়নি!

সাধনা ভেবে চিন্তে বলে, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। ভুল যদি বুঝে থাকো, তুমি নিজেই ভুল বুঝেছো। কেউ যদি ঠকিয়ে থাকে, তুমি নিজের বোকামিতেই ঠকেছো। আমি তাই বলি কি, গায়ের জ্বালায় ঝগড়া না করে, সোজা-সুজি পষ্টাপষ্টি কথা কয়ে বোঝাপাড়া করে নাও।

: কথা কওয়ার আর কি আছে ?

: আছে বৈকি ? শুধু মানুষটাকে দেখো না, অবস্থাটাও খেয়াল কর।

আশা মুখ বাঁকায়। অর্থাৎ তার চেয়ে আজ কার অবস্থা খারাপ ?

: ওর মনের জোর নেই এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। উপায় কি বলো ? তুমি তো আর গড়েপিটে মানুষ করনি তাকে। মানুষটা কষ্ট সইতে পারেন না, সইতে শেখেন নি। কি এমন হাতিঘোড়া চান ? ধার যে করেন, ফুর্তি করতেও নয়, বদখেয়ালে উড়িয়ে দিতেও নয়। দুটো জামা পরবেন, একটু সিনেমা দেখবেন, ভালমন্দ এটা ওটা খেয়ে খিদে মেটাবেন। আসলে এ তো সামান্য চাহিদা। বরাবর পেয়ে এসেছেন, এখন পান না, সে দোষ তো সঞ্জীববাবুর নয়। নিরুপায় হলে কষ্ট করতেই হয় মানুষের, সেটাই উনি পারছেন না। তোমার মনে জোর আছে তুমি পারছ, ওঁর সে জোরটুকু নেই। নইলে যতটা খারাপ ভাবছ, অতটা খারাপ নয়।

: তুমি যে উকিলের মত ওকালতি করলে !

: সঞ্জীববাবুর উকিল নই, আমি তোমার স্বার্থই দেখছি। মানুষটা ভাল কিন্তু ভদ্রলোকের মনের জোর নেই—এটা তোমাকে মানতেই হবে। মেনে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে, সব দিক যাতে বজায় থাকে।

আশা তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, এর পরেও বজায় থাকবে ? কি করে বজায় থাকে ? সর্ব্বনাশ হতে বসেছিল, চাকরীটা

পর্য্যন্ত যেত। আমি অতি কষ্টে ঠেকিয়েছি। আবার কে ঠেকাবে? মনের জোর তো আর আকাশ থেকে আসবে না।

সাধনা বলে, আমিও তাই বলছি। এটুকু তোমায় বুঝতেই হবে ভাই। তুমি নিজে কষ্ট করে ব্যবস্থা করে সামলাতে পারবে না। একবার চেষ্টা করেছো বেশ করেছো, পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেল। তুমি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মনের জোর এনে দিতে পারবে না। নিজে বিপদে পড়ে পোড় খেয়ে নিজের মনটাকে নিজেকেই ঠিক করতে দিতে হবে ওঁকে। যার দায়িত্ব তাকেই সব ছেড়ে দাও। যা কিছু আসল ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুমি যতটা পার সামলে সুমলে চলবে, সাহায্য করবে।

ঃ ফল কি হবে সে তো জানা কথা! নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে।

ঃ সে তো এমনিও ডোবাবেন, ওমনিও ডোবাবেন, তুমি কিছু করতে পারছ কি? ডুবতে বসলে বরং বাঁচার চেষ্টা আসবে, মনটা শক্ত হবে।

আশা সংশয়ভরে বলে, এততেও যার শিক্ষা হল না, সে কি শিখবে কোনদিন?

সাধনা ভরসা দিয়ে বলে, শিক্ষা হতে দিলে কই তুমি? বিপদে পড়তে না পড়তে সামলে দিলে। কষ্ট যা করার তুমি করছ, তার গায়ে কি আঁচ লাগছে? মনে যত কষ্ট হোক, অনুতাপ আপশোষ হোক, ওটা শিক্ষার ব্যাপার নয়। হাতে-

বাতে শিখতে দিতে হবে। চাকরী যায় যাবে, চাদ্দিকে দেনা করে করবে। তোমার কপালেও দুঃখ আছে অনেক। কিন্তু কি এমন সুখে আছ? ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ক'দিন চালাবে? তার চেয়ে মানুষটার চেতনা হোক, দু'জনে মিলে আবার উঠবে।

আশা তো বোকা নয়। সাধনা এত কথায় যা বোঝাতে চেয়েছে, সে দু'কথায় তার আসল মানেটা তুলে ধরে।

বলে, সোজা কথায়, আমাকে কর্তালি ছাড়তে বলছ। সরলা অবলা বৌ হব, স্বামীর ওপর নির্ভর? সে আনবার মালিক এনে দেবে, আমি রেঁধে দেব। কোথা থেকে কি করে আনছে সে ভাবনা তার।

সাধনা একটু হাসে।

: হাবা সাজতে কি পারব?

: পারবে। পারতে হবে। আজ মিলেমিশে বোঝা বইতে চায় না, জোর করে বোঝার ভাগ নেওয়া কি খুব সম্মানের? দেখলেই তো, ওতে লাভ হয় না, বোঝা নিয়ে টানাটানি মারামারিই ঘটে। ঘরে চুপচাপ ভালমানুষটি সেজে থাকেন, বাইরে গিয়ে নিজের মূর্তি ধরেন। তার চেয়ে যেমন চান তাই হোক। দু'দিন যাক, টের পাবেন, নিজেই ডাকবেন পাশে এসে দাঁড়াও, হাত মেলাও।

আশা বুদ্ধিমতীর মত বলে, কথায় তো হ'ল। দেখি কাজে কি হয়।

বাসন্তী সব শুনে বলে, তুইও যেমন ভাই, জলের মত সব

বুঝিয়ে মীমাংসা করে দিলি। একটা নীতি খাড়া রেখে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা ঘর-সংসার করতে পারে ?

: তুই তো করছিস। ছিটেফোঁটা সুখ চাই না, হলে আগের মত, নইলে নয়। ঝি পর্য্যন্ত রাখিস না।

বাসন্তী গালে হাত দেয়।—এটা নীতি নাকি ? আশাদি যে কষ্ট করে আসছে, ওর নাম নীতি করা বুঝি ? দরকার হয়েছে, উপায় নেই, তাই আমিও এসব করছি, আশাদিও করছে। কিন্তু তুই আশাদিকে যে পরামর্শ দিয়েছিস তাই সে একেবারে খাসা নীতি! তুমি ওরকম ছিলে আজ থেকে এরকম হবে, নরম হয়ে থাকবে, রাগ হলে ঝগড়া করবে না, নালিশ করবে না, কিচ্ছু করবে না! তাই নাকি মানুষ পারে ?

জোরে জোরে মাথা নাড়ে বাসন্তী, উহুঁ, পারে না। তাছাড়া কার যে দোষ তুই ধরতেই পারিস নি। ওর জন্যেই তো মানুষটা ফের বিগড়েছে।

: তাই নাকি ?

: তাই। একশোবার তাই। কর্তালি করেছে তো কি হয়েছে ? তুমি বৌ, বৌ হয়ে কর্তালি করনা যত পার, মাষ্টারণী হয়ে কর্তালি করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বৌ হবার সাধ্যি নেই, শাসন করার গুরুঠাকুর! না খেয়ে না পরে আমি কী কষ্টটাই করি! আমি মনে মনে কি বলি জানো ? বলি, আহা, মরি মরি! হাসি নেই, কথা নেই, মুখটা যেন ভাতের হাঁড়ি, বাড়ীতে যেন দশটা রুগী মর' মর'

চব্বিশঘণ্টা এমনি ভাব—অমন কষ্ট নাই বা করতে তুমি। তার চেয়ে হেসে দুটো কথা কইলে মানুষটার বেশী উপকার হত।

বাসন্তী কথা বলছিল উনান সাজাতে সাজাতে। আব্দার জানিয়ে বলে, মুখে একটা পান গুঁজে দেনা ভাই?

পান মুখে এলে চিবিয়ে গালে রেখে বলে, এটুকু যদি বোঝাতে পারতে, কাজ হত। মানুষ তো লোহায় তৈরী নয়? ঘরে একটু আদর পেলে স্বস্তি পেলে ও মানুষটা কখনো ধার করে বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখত, হোটেলে খানা খেত? তারা অন্য জাতের লোক। ঘরে তারা গোবেচারী সেজে থাকে না বৌয়ের ভয়ে, বৌকে লাথি মেরে গয়না নিয়ে ফুর্তি করতে যায়।

কথাটা লাগসই মনে হয়। কিন্তু খটকা যায় না। এতই কি সহজ এ ব্যাপারের শেষ কথা?

একজন বাইরে লড়বে, ক্ষতবিক্ষত হবে, ঘরে ফিরলে আরেকজন তাকে একটু আরাম দেবে বিরাম দেবে ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেবে মমতার—বাস, আর কিছুই চাই না?

এতখানি সহজ আর ব্যক্তিগত এ লড়াই?

ঘর হল পুরুষ সৈনিকের দেহমনের হাসপাতাল আর মেয়েরা হল তাদের নার্স?

তাই তো ছিল এতকাল! লড়াই তবে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে কেন? ভাঙ্গন ধরছে কেন এই অপরূপ ব্যবস্থায়?

এক একটি নীড় তো এক একটি দুর্গ বিশেষ ছিল রোজগেরে স্বামীর। তার মনের মত হাসি আনন্দ আদর মমতা তার জন্য তৈরী হয়েছে সেখানে। মেয়েরা বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহিনী হয়ে তো ভেঙ্গে ফেলে নি সে দুর্গ, ওলট-পালট করে দেয় নি পুরুষের লড়াই করে ঘরে ফিরে শান্তি আর স্বস্তি পাবার ব্যবস্থা?

হাসিমুখে দুটো কথা কইবে আশা? পেটের সঙ্গে প্রাণটা যখন জ্বলছে তখন নিজের বগলে সুড়সুড়ি দিয়েও হাসি আনতে পারে মানুষ?

হাঁড়িতে ভাতের অভাবের জন্য মুখটা যখন ভাতের হাঁড়ি—

ঘরে ফিরে সাধনা উনান ধরায়। হাঁড়ি চাপাতে হবে।

৬

রাখাল বলে, তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

সাধনা ভাবে, সর্ব্বনাশ! কি দুঃসংবাদ কে জানে!

হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছতে মুছতে সাধনা এসে বসে। রাখাল তার ধোয়া হাতে তুলে দেয় নয়া প্যাটার্ণের নতুন সোনার দুল।

ঃ এই কথা!

ঃ না, এটা আসল কথা নয়।

আসল কথাটা ব্যবসা নিয়ে। এতদিন রাজীবের আগেকার দায় ছিল, সম্প্রতি সেটা শেষ হয়েছে। আর তাকে দফায় দফায় কিস্তির টাকা দিতে হবে না। টাকাটা সে কার-বারে লাগাবে। রাখালকেও সে অনুরোধ করেছে, লাভের অংশ কম টেনে কারবারে লাগাতে।

সাধনা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

ঃ অত খুঁটিনাটি বুঝিনে আমি। আমায় কি করতে হবে বল।

আগে হয় তো রাখাল আহত হত। প্রিয়া কবিতা বোঝে না জানালে নতুন কবি যেমন আহত হয়। সুরুতে প্রায় কাব্যসৃষ্টির উন্মাদনা নিয়েই সে নোংরা অশ্রদ্ধেয় বিড়ির পাতা সুখা তামাকের ব্যবসা সুরু করেছিল, ধরা-বাঁধা জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেটাই ছিল নতুন সৃষ্টির ঝোঁক।

আজকাল ওসব অভিমান তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

সে বলে, আসল কথা, কিছুদিন কষ্ট করতে হবে।

ঃ করব!

তার এই নির্ব্বিকার উদাসীন জবাবটা আঘাত করে রাখালকে।

ঃ শেষকালে কেঁদেকেটে ঝগড়া করে অনর্থ কোরো না। বেশীদিন নয়, কয়েকমাস একটু টানাটানি যাবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ বেশ তো।

তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে রাখাল হাতের মোটা চুরুটটা মুখে গুঁজে ধরায়। শুধু বিড়িপাতা সুখা আর সাধারণ চলতি সিগারেট নিয়ে তাদের কারবার—সম্প্রতি সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কয়েকরকম চুরুট তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কবে এককালে ছবি আঁকা পদ্য লেখার ঝোঁক চেপেছিল কিছুদিন, সেই বিদ্যা নিয়ে নিজে একটা চৌকো পিচবোর্ডে জলন্ত চুরুট ধরা একটা হাত এঁকে তার নীচে লিখেছে, "চুরুট খান : একটা চুরুট দশটা সিগারেট, পঞ্চাশটা বিড়ির সামিল !, দাম কত সস্তা পড়ে! তিনবার চারবার নিভিয়ে খান একটা চুরুট !"

রাজীব সংশয়ভরে বলেছিল, ঠিক কথা লেখা হল কি? এ রকম হলে সবাই তো চুরুট খেত!

রাখাল বলেছিল, এটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে বেঠিক কথা লিখতে হয়। ওটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট।

: বটে নাকি।

: তবে? একটা বিজ্ঞাপন দেখান তো আমায় যা স্রেফ ভণ্ডামি আর মিথ্যা নয়? কেমন করে বোকা লোককে ভাঁওতা দিয়ে ঠকানো যায়, এটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট। নইলে কি করে বিজ্ঞাপন দিতে হয় তার এক্সপার্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার বড় বড় কোম্পানী গড়ে ওঠে? পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন থেকে মডার্ণ বিজ্ঞাপন সব ওই এক ধাপ্পাবাজি।

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আপনিও শেষে ওই ধাপ্পাবাজি করে বসলেন?

: মোটেই না। আমি শুধু জানিয়ে দিলাম আমাদের এখানে চুরুটও পাওয়া যায়।

সাধনা কি ভাবছে বুঝতে না পেরে রাখালের মুস্কিল হয়। রাগত মনোভাবটা দমন করে চুরুটে টান দিয়ে রাখাল বলে, রাজীবটা হল গিয়ে একেবারে সেকেলে ব্যবসায়ী। আমি যেমন চাকরী করতাম, ও ঠিক তেমনি ব্যবসা করে। বাপ-ঠাকুর্দ্দার বাঁধা নিয়মে। জগৎ পাল্টায় তো ওদের নিয়ম পাল্টায় না। সকাল সন্ধ্যায় ধূপধুনো দেবার কি ঘটা! কালীর ছবিকে প্রণাম করবে, গণেশকে প্রণাম করবে, তারপর মাথা ঠেকাবে কাঠের ক্যাশ বাক্সটায়!

: ক্যাশটাই তো আসল।

রাখাল হাসে, ক্যাশ ছাড়া বোঝেই না। ব্যাঙ্কে একটা একাউণ্ট পর্য্যন্ত খোলে নি। লোহার সিন্ধুক আছে, আবার ব্যাঙ্ক কেন? আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা জয়েণ্ট একাউণ্ট খুলিয়েছি

নতুন দুল কানে লাগিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে সাধনা বলে, এটা না আনলেও চলতো। এসব ঝোঁক আমার কেটে গেছে। ছাখো না খালি গলায় ঘুরে বেড়াই?

: এ বৈরাগ্য চলবে না। আমি এদিকে কতরকম ভাবছি, বিকালের পড়ানোটা ছেড়ে দিয়ে আরও কোমর বেঁধে নেমে পড়ব, টাকা করব,—গয়না পরতে তোমার অরুচি জন্মাবে কি রকম?

: অনেক টাকা করবে ভাবছ, না? লাখ টাকা?

ঃ লাখের বেশী নেই ?

সাধনা সোজা তার দিকে তাকিয়ে বলে, কি আশ্চর্য্য ছ্যাখো, আমি জানতাম তোমার এ ঝোঁক আসবে! খুব যখন টানাটানি চলছিল, তখন মনে হয়েছিল কথাটা। টাকার জন্য ভীষণ কষ্ট পেলে, এরপর তোমার রোখ্ চাপবে টাকা করার। তাই সত্যি হল।

ঃ আমি কিন্তু মোটে দু'চার মাস এসব ভাবছি। রাজীবের সঙ্গে কারবারে না নামলে হয় তো কোনরকমে দিন চালাবার চিন্তাই করতাম।

ঃ এ ঝোঁক তোমার আসতই। একটু সামলে নেবার অপেক্ষায় ছিলে।

ঃ তুমি চাওনা টাকা ?

ঃ চাই। গয়না পরব না পরব জানি না, চারবেলা ভোজ খাব আর দু'ঘণ্টা অন্তর নতুন নতুন কাপড় পরব!

টাকার চিন্তার চেয়ে টাকা করার চিন্তায় রাখাল আজ কম মসগুল নয়। টুইসনি, ফালতু রোজগার আর চাকরীর ধান্ধায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে সময়ও তার এখন কম যায় না টাকা করায় চেষ্টায়।

একটা ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত ঠেকে তার কাছে। আজ আরও বেশী টাকা করার নেশায় মেতে থাকার সঙ্গে আগের দিনের সেই দিবারাত্রি টাকার ভাবনা আর ছেলে পড়িয়ে চাকরী খুঁজে বেড়াবার ধান্ধায় মেতে থাকার মধ্যে সে যেন একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পায়! টাকার অভাবে কষ্ট পাওয়াটুকু

বাদ দিলেই যেন মিলে যায় নেশাটা। সেদিন টাকার চিন্তায় ডুবে থাকত নিরুপায় হয়ে, আজ স্বেচ্ছায় টাকার চিন্তায় ডুবে আছে।

টাকার চিন্তা ছাড়া একদণ্ড শান্তি নেই।

তবু, চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেড়ে গেছে। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটছেই ব্যবসা সূত্রে, জানা চেনা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম উঠে গিয়েছিল তাদের সঙ্গেও আজকাল মাঝে মাঝে দেখা হয়, পাড়ার লোকের সঙ্গে চলে মেলামেশা আর মনে প্রাণে উদাসীন হয়ে থাকার বদলে স্বেচ্ছায় তাদের ভালমন্দের খবর রাখা।

সাধনা যেমন জমিয়ে তুলেছে পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে সে-রকম মেলামেশা নয়। বাড়ী বাড়ী ঘুরে বসে বসে গল্প জমিয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব করার সময় তার নেই।

কাজে যেতে আসতেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ বসে থাকে দাওয়ায়, কেউ সামনে পড়ে পথে, কারো সঙ্গে দেখা হয় মুদী দোকানে রেশন-খানায় বাজারে, কারো সঙ্গে বাসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা হয়, তাতেই আদানপ্রদান হয় আসল খবরগুলির, তাতেই বজায় থাকে এবং গড়ে ওঠে হৃদ্যতা।

কারো বাড়ীতে অসুখ বিসুখ, কাজে বেরিয়ে যাবার সময় একটু ঘুরে খবর জেনে যাওয়া যায় কয়েক মিনিট বাড়তি সময় দিয়ে।

দোকান যেদিন বন্ধ থাকে সেদিনও নিজের কাজে ঘরের

কাজে তাকে ছুটোছুটি করতে হয়, তবু দেখা যায় পাড়ায় বা আত্মীয়বন্ধুর বাড়ী ক্রিয়াকর্মে গিয়ে সামাজিকতা বজায় রাখা থেকে পাড়ার বৈঠক বা আড্ডায় গিয়ে বসার জন্য সময়ের অভাব হয় না মোটেই।

এই মেলামেশার ফলে স্থানীয় নানারকম লৌকিক ব্যাপারে তাকে আজকাল ডাকা হয়। সে সবে অংশ নিতেও তার অসুবিধা হয় না।

এমনি পার্থক্য টাকার চিন্তায় হন্যে হয়ে বেড়ানো আর টাকা করার সাধকে সাধনায় দাঁড় করানোর মধ্যে!

সময় তখনও থাকত। কিন্তু আত্মীয়তা বন্ধুত্ব সামাজিকতার জন্য সময় দেবে কে? সে ইচ্ছা আসবে কোথা থেকে? মেলামেশার বদলে ঘরের কোণে একলা বসে চিন্তাজ্বরে মুহ্যমান হয়ে থাকতেই তখন ভাল লাগত। দেখা হলে পাড়ার মানুষের কুশল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে দাঁড়াবার তাগিদ জাগত না, হাঁটতে হাঁটতেই ছুঁড়ে দিত দুটো চলতি শব্দ—চলে যাচ্ছে!

কাজের মানুষ দশজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার সময় পায় না—এ মিথ্যা অজুহাত ফাঁস হয়ে গেছে রাখালের কাছে।

সেও আজ কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ।

দশজনের জীবনকে সাধ্যমত এই সম্মানটুকু দেওয়ায় যেন বিবেকের জ্বালাও তার খানিকটা শান্ত হয়েছে—যে দশজনে বিশুর মার গয়নার ব্যাপার জানলে তাকে চোর বলত।

সাধনার যে শান্ত নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার ভাব আরেকটা দুঃস্বপ্নের মত ঘনিয়ে এসেছিল তার জীবনে, দশজনের সম্পর্কে দুজনেরি মাথা ঘামাবার মাধ্যমে যেন তারও ঘোরটা কেটে গেছে আশ্চর্য্যজনক ভাবে।

সাধনা বলে, শোভার বিয়ে ঠিক হল শেষ পর্য্যন্ত।

রাখাল বলে, শুনলাম ওর দাদার কাছে। আপশোষ করছিল, বোনের জন্য শেষে বুড়ো বড় আনতে হল, লেখাপড়াও ভাল জানে না। কিন্তু উপায় কি, শোভার বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে।

সাধনা খুসী হয়ে বলে, তুমি শুনেছ সব ?

ঃ শুনেছি বৈকি। তোমার কাছে শুনেছি, ওদের কাছেও শুনেছি।

বাসন্তীর সঙ্গে কত কথা হয়েছিল শোভার বিয়ের সমস্যা নিয়ে, কত পরিষ্কার মনে হয়েছিল সমস্যাটা। বরটি কেমন সমস্যা তা নয়, সমস্যা মোটামুটি খাওয়াপরা জোটার। আজ আবার বিষম খটকা লেগেছে সাধনার মনে। প্রায় ষাট বছরের বুড়ো ? শোভা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। মন খারাপ হবার লক্ষণও দেখা যায় নি !

অবুঝ কচি মেয়ে নয়। বুড়ো বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেবার তথাকথিত ব্যাপারও নয়। শোভা শুধু মুখ ফুটে 'না' বললেই এ বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

কিন্তু 'না' যে বলে নি ! জিজ্ঞাসা করা হলে বরং নীরবে সায় দিয়েছে।

মনের ঝাঁঝটা কথায় বেরিয়ে আসে সাধনার, বলে, মেয়ে নাকি এই বরের নামেই খুসী! এ কি ব্যাপার, এ্যাঁ? কোন মেয়ে এমন বিয়ে চাইতে পারে?

রাখাল তার জানা যুক্তিটাই দেখায় শোভার পক্ষে, বলে বাপের বাড়ী চাকরাণীর মত জীবন কাটাতে হয়। স্বামী বুড়ো হোক আর যাই হোক, নিজের সংসারে খেয়ে পরে থাকবে।

: সেটাই কি সব?

: সব নয়, মন্দের ভালো।

সাধনা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। খাওয়াপরার জন্য এরকম একজনের পাশে শোয়ার চেয়ে স্বাধীনভাবে ঝি-গিরি করা ভাল নয়?

: স্বাধীনভাবে ঝি-গিরি? তুমি পাগল হলে নাকি? আসলে তুমি নিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ ও মেয়েটাকে। ঘরের জন্য ওরকম বরের কথা ভাবতেও তোমার ঘেন্না হয়। কিন্তু শোভার কি সে তেজ আর চেতনা আছে? ওর কাছে আগে।

: আজও এমন মেয়ে রয়ে গেল কি করে?

: রেখে দেওয়া হয়েছে বলে!

: এত কাণ্ড চারিদিকে, ওর মনে কি ধাক্কা লাগে না?

: লাগে। ঢেউ ওঠে, মিলিয়ে যায়। তবে এতো নিষ্ফল হবার নয়, একদিন প্রতিক্রিয়া হবেই। অন্য মেয়ে হলে বিয়ের আগেই কেলেঙ্কারি করত, কারো সঙ্গে হয় তো

বেরিয়েও যেত। ওর প্রতিক্রিয়া আসবে বিয়ের পর। যখন টের পাবে কি ভাবে কি জন্য ঠকেছে

কি আকাশ পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও! সুমতীদের মত মেয়েরা আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয়—ঘরের কোণে নিরীহ গোবেচারী শোভারা মুখ বুজে উদয়াস্ত খেটে যায়, বিনাপ্রতিবাদে নিঃশব্দে মেনে নেয় ভাগ্যে যেমন জোটে ঘর আর বর!

প্রাণটা জ্বলে যায় সাধানায়।

আরও জ্বলে যায় নীলাম্বরী শাড়ী পরে শোভাকে আজ একা বাড়ী থেকে বেরোতে দেখে।

ঃ দিদি আপনাকে যেতে বলেছে।

ঃ তা নয় বলেছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো?

ঃ আমি একটু নমিতাদের বাড়ী যাব।

সাধনা হেসে বলে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বুঝি বেরিয়েছো ঘর ছেড়ে? খুব ফুর্তি হয়েছে, না?

শোভার নত চোখ আর মৃদু হাসি দেখে গালে তার একটা চড় মারতে সাধ হয় সাধনার।

মুখ ভার করার প্রতিবাদটুকুও জানাতে পারে না? ওর মনে ঢেউ ওঠে না ছাই হয়!

ওর ভাগ্য-মানা মনের ডোবায় ঢেউ তোলার সাধ্য নেই কালবৈশাখী ঝড়েরও!

নিজের বেলা যেরকম বিয়ের কথা ভাবতেও তার ঘেন্না

হয়, সেই বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে সেজেগুজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে—জগতকে যেন জানিয়ে দিতে চায় যে এতদিনে গতি হল তার!

দুর্গার কথা সে ভাবে। ঘরহারানো গরীব পরিবারের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়েতে শুধু বর পেয়েছে, ঘর হারানো বর। ঘরের চেয়ে বড় হয়ে থেকেছে মানুষ। ঘর ভেঙ্গে পড়ার অভিশাপ কি তবে আজ দরকার শোভার মত মেয়েদের নিজেকে মানুষ বলে জানতে পারার জন্য ?

এতই বিতৃষ্ণা জন্মে মেয়েটার উপর, মানুষ হিসাবে এতই সে তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে যে তার কথা ভাববার প্রয়োজনও যেন তার ফুরিয়ে যায়।

নিজের এবং অন্যান্য জীবনের বিচিত্র সুখদুঃখ সংঘাত যে আলোড়ন তোলে তার মনে শোভা তার মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

আশা কি বোঝাপড়া করেছে সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুই সে খুলে বলে নি সাধনাকে। গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করার সঙ্কোচটাও সাধনা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

তবে মনে হয়, তার পরামর্শই গ্রহণ করেছে আশা। নরম হয়ে বিনীতা স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছে।

পরিবর্তন বিশেষ কিছুই ঘটে নি সংসার যাত্রায়, সব দিক দিয়ে যে কঠোর আত্ম-নির্য্যাতনের ব্যবস্থা চালু করেছিল আশা সেটা মোটামুটি এখনো বজায় আছে, সঞ্জীব শুধু ভয়ে ভয়ে যেন আশার নতুন মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বাজার থেকে

আনছে একটু মাছ, কালোবাজার থেকে আনছে দু'এক সের চাল।

একখানা নতুন শাড়ীও সে কিনে দিয়েছে আশাকে।

আশা চুপচাপ মাছটুকু রাঁধছে, হাঁড়িতে চাল চড়াচ্ছে পেট ভরে খাওয়ার মত, নতুন শাড়ীটা গায়ে জড়াচ্ছে।

জিজ্ঞাসাও করছে না তুমি টাকা পেলে কোথায়, মুখ ফুটে প্রতিবাদও জানাচ্ছে না।

মুখখানা তার হয়ে আছে ম্লান এবং গম্ভীর। কথা সে বলছে আরও কম। সঞ্জীব যা বলে যা করে তাই সই, তার কিছু বলারও নেই করারও নেই।

নীরবে নিজের মনে নিজের কড়া দুঃখ ক্ষোভ আর বিদ্রোহের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে সংযত রাখছে।

সঞ্জীব আপিস চলে গেলে তার এঁটো থালা গেলাস কুড়িয়ে নিয়ে কলতলায় যেতে যেতে হঠাৎ ঝনঝন করে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ ছটফট করে বেড়ায় ঘরে আর বাইরে। হঠাৎ বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে।

তারপর উঠে স্নান না করেই ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসে' দু'এক গ্রাস খায়—উঠে দাঁড়িয়ে ঘটির জল ঢক ঢক করে মুখে ঢেলে লাথি মেরে ভাতের থালা মাছের বাটি ছিটকে সরিয়ে দিয়ে, ঘটিটা আছড়ে ফেলে ঘরে চলে যায়।

সাধনা আসছে টের পেয়েই ভেতর থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

আধঘণ্টা পরে অবশ্য নিজেই সে সাধনার ঘরে যায়।

শুধু একটু হাসে। সত্যই হাসে।

সাধনা সাহস পেয়ে বলে, পরামর্শ দিয়ে আমি বুঝি তোমার অনিষ্টই করলাম ভাই।

আশা তেমনি ভাবে হাসে। বলে, শুনে রাগ কোরো না, তোমার পরামর্শ আমি এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিয়েছি।

ঃ তবে— ?

ঃ সে তুমি বুঝবে না।

সতীশের শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছিল। কোন অসুখ নয়, শুধু ভাঙ্গন। বিশুর মার ধোয়া মোছা গোবর লেপা ব্রত পার্ব্বণ পূজা আর প্রসাদ ও দক্ষিণা বিতরণ বজায় থাকলেও সব যেন কেমন যান্ত্রিক হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে।

আরেকদিন আরেক উপলক্ষে রাখাল পায়েস পিঠে পায়। কিন্তু সে যেন নেহাৎ তাকে না দিলে নয় বলে, আগে মহাসমারোহে দেওয়া হয়েছে বলে, কোনরকমে নিয়মরক্ষার জন্য দেওয়া হল।

নির্ম্মলা বলে, কইতে আমায় মাথা কাটা যায় আপনের কাছে। গরুগুলারে পশ্চিমা গোয়ালার কাছে বেইচা দিছে। কত কইলাম, দুধ দেয়, গরু বেচেন ক্যান দিদি? দিদি কয়, তুই মুখ বুইজা থাক মুখপুড়ি!

একটা নিশ্বাস ফেলে নির্ম্মলা।

মুখপুড়ি কয়। ক্যান, মুখ পুড়াইলাম কিসে? জানি আপনে মানুষ না, দেবতা। জানি কোনকালে ভুইলা আমার হাতখান ধরবেন না। ভাবি, না ধরলেন হাত, দেবতা মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছেন আপনে, আপন ভাইবা আপনে দরদ দিয়া দুইটা কথা কইলে আবাগী আমার পাপের জন্ম ধন্য হইবো।

নির্ম্মলা কপাল চাপড়ায় ডান হাত দিয়ে।—দিদির বড় খাতিরের মানুষটা সতীশবাবু। কয়বার গুণ্ডা ডাকাইতের নাখান হাত ধরছে দিদি জানে? দিদি মন্দিরে পূজা দিবার যায়, বুড়া রাক্ষসটা আমারে টাইনা নিয়া যায় দিদির ঘরে।

নির্ম্মলা কেঁদে ফেলে।—আপনে দেবতা। পায়ে ধইরা কইলেও হাত ধরেন না। আপনে ক্যান খাইটা মরেন? আপনার ক্যান টাকা নাই? আমি জানি, আপনাগো টাকা থাকে না। ডাকাইতগুলার টাকা ছাড়া কথা নাই, আপনে কি নিয়া পাল্লা দিবেন? চুরি ডাকাতি আপনার কাম না।

রাখাল তার হাত ধরে। নিজের দেবতাত্ব ভুলে গিয়ে অবশ্য নয়।

নির্ম্মলারও সে ভুল হয় না।

সহজে আর ভাঙ্গবার নয় তার বিশ্বাস। ব্রতপূজা অন্তহীন আচারবিচার বাইরের নানা আড়ম্বরের আড়ালে মনুষ্যত্ব-হীনতার আড়ত জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলে তার জীবন কেটেছে, ছেলেবেলা বিধবা হয়ে আজ তার সাতাশ বছর

বয়স। সে বিশ্বাস করতে পারত না যে নিজে যেচে হাত ধরে টানলেও মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে,—দেবতা ছাড়া এটা অসাধ্য।

রাখাল তাই তার কাছে সত্যই দেবতা।

রাখাল গভীর মমতার সঙ্গে বলে, যেসব দিন চলে গেছে, যেতে দাও। যে জেলখানায় আটক ছিলে সেটা ভেঙ্গেই পড়ছে। আপশোষ করে লাভ কি হবে? জীবন তো তোমার ফুরিয়ে যায় নি, এবার অন্যভাবে গড়ে তোল জীবনটা।

একটি হাত তার ধরাই থাকে রাখালের হাতে। অন্য হাতে চোখ মুছে সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ঃ এই জীবন দিয়া আর কি করুম?

ঃ জীবন কি ফেলনা মানুষের? আমি তোমায় শিখিয়ে দেব কি করে নতুন জীবন গড়বে।

হাত টেনে নিয়ে নির্ম্মলা গড় হয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল নির্মলা, বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হবে শোভার। দু'জনেই তারা জানেনা জীবন নিয়ে কি করবে। হতাশার সঙ্গে মানুষের উপর তীব্র একটা বিদ্বেষ আছে নির্ম্মলার—জীবনের অভিজ্ঞতায় যার জন্ম। আশ্চর্য্য এই, শোভার হতাশাও নেই জ্বালাও নেই।

কেন জ্বালা নেই বলে গায়ের জ্বালায় সাধনা আক্ষেপ করেছে তার কাছে!

শোভারও একদিন আসবে হতাশা আর জ্বালাবোধ। অভিজ্ঞতার সঙ্গে আসবে। যে কৃত্রিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে তার মন সেটা কেটে গেলেই আসবে।

সাধনা বলে, ও মেয়েটার কথা বোলো না আমায়, ঘেন্না হয়। তোমার ওই নির্ম্মলার জন্য মায়া হয়, বেচারীর উপায় ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটা কি? ওতো আর বেড়াজালে আটক থাকে নি জন্ম থেকে।

সাধনার কাছে এতটুকু ক্ষমা নেই শোভার।

তার নিজের জীবনের সমস্ত বন্ধন সঙ্কীর্ণতা অসহায়তা আর অপমানেরই প্রতীক হয়ে যেন দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

প্রভার সঙ্গে শোভা তার বাড়ীতে বেড়াতে এলে ভদ্রতার খাতিরেও সে এই ঘৃণা আর অবজ্ঞা চাপতে পারে না।

শোভা টের পেয়ে বলে, সেজদি, আমি একটু ঘুরে আসছি।

সে চলে গেলে প্রভা হেসে বলে, আগে ঘর ছেড়ে বেরোত না। ক'দিন খুব যাচ্ছে বন্ধুদের কাছে। আজকালকার মেয়ে তো, বিয়ের আগে জামাটামার প্যাটার্ণটি পর্য্যন্ত নিজেরাই পরামর্শ করে ঠিক করবে।

প্রভার হাসিভরা মুখেও একটা চড় কষিয়ে দেবার সাধ জাগে সাধনার। বিয়ের নামে বেশ্যাবৃত্তি করার সুযোগ পেয়েছে বলে শোভা খুসী, প্রভাও খুসী বোনকে এই সুযোগ জুটিয়ে দিতে পারছে বলে।

ভোলার মা আজও ডিম বেচে। মাঝখানে গরমে ডিম

তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত বলে কিছুদিন ডিম বন্ধ রেখে তরকারী বেচেছিল। কুমড়োর ফালি, কাঁচা আম, কাঁচা লঙ্কা, লেবু এই ধরণের তরকারী। দু'এক পশলা বৃষ্টি নেমে গরম কমায় আবার সে ডিম বেচছে, তার সঙ্গে কিছু কিছু তরকারী বেচাটাও বজায় রেখেছে।

রাখাল বলে, তুমিও কারবার বাড়াচ্ছ ভোলার মা ?

ঃ উপায় কি কন ? লাভ থাকে না।

ঃ ঠিক বলেছ। আমাদেরও ওই দশা। মালের দর চড়ছে, লাভ জমে যাচ্ছে ওপরের দিকে, আমাদের কপালে ঢুঢু !

ভোলার মার কাছে একটা গুরুতর খবর শুনে সাধনা কলোনিতে গিয়েছিল, সেখানে দেখা হল সুমতীর সঙ্গে।

সেও ওই বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে এসেছে।

বলে, আপনি প্রায়ই এদিকে আসেন শুনেছি।

ঃ আমি এমনি আসি এদের সঙ্গে কথাটথা বলতে। কি হাঙ্গামা হয়েছে শুনছিলাম।

: প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, নিজেরা না উঠে গেলে মেরে তাড়াবে।

ঃ তাড়ালেই হল ! পাড়ায় লোক নেই !

সাধনার উষ্ণতায় একটু আশ্চর্য্য হয়েই সুমতী তার দিকে তাকায় ! বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু লোক থাকলেই তো হয় না, তাদের একসাথে জোটাতে হয়। প্রভাতবাবুর ভাড়াটে লোক হঠাৎ এসে হাঙ্গামা করবে। বড় কলোনি হলে ভিন্ন কথা ছিল, এইটুকু কলোনি, ক'জন আর

মানুষ। পাড়ার লোক আসতে আসতে এদের দফা শেষ হয়ে যাবে!

শুনে সাধনা চিন্তিত হয়ে বলে, প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, ওকেও শাসিয়ে দিলে হয় না? দশজনে গিয়ে যদি আগে থেকে ধমকে দেয় যে এসব কুবুদ্ধি চলবে না, ওর কি সাহস হবে হাঙ্গামা করতে?

সুমতী আবার একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আপনি তো মন্দ কথা বলেন নি! হাঙ্গামা হবার আগেই ঠেকাবার চেষ্টা করলে দোষ কি? আমি আজকেই সমিতির সভায় তুলব কথাটা।

কথা বলতে বলতে শোভার কথা উঠে পড়ে।

সুমতী বলে, শোভার বিয়ে হচ্ছে জানেন? মল্লিকদের বাড়ীর শোভা?

ঃ শুনেছি।

ঃ কি কাণ্ড দেখুন, মেয়েটা গিয়ে আমায় ধরেছে, বিয়ে বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। এত লোক থাকতে আমায় গিয়ে ধরেছে, এই সেদিন আমি জেল থেকে বেরিয়ে এলাম! ওর বাড়ীর লোকের সঙ্গে শুধু জানাশোনা আছে, এই পর্য্যন্ত। আমি বলতে গেলে তারা শুনবে কেন আমার কথা? বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। ওদের বাড়ীর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার কথা বলার কি অধিকার? শোভা ছাড়বে না, আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সাধনা যেন আকাশ থেকে পড়ে শুনছিল, শোভা চায় না বিয়েটা হোক?

: তাইতো বলছে। তিনবার গিয়েছে আমার কাছে। কত বুঝিয়ে বলেছি তোমার মত নেই এটা জোর করে বাড়ীর লোককে জানিয়ে দাও? নিজে না পার, বৌদিরা আছে, দিদি আছে, তাদের কাউকে দিয়ে বলাও? তা, বলে কি, বলতে টলতে ও পারবে না, বলে কিছু লাভ নেই। কি ভীরু বলুন তো মেয়েটা? বলে কিনা, আপনি তো নানা কাজ করেন, আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিন। তার মানে বুঝেছেন? বাড়ীতে লড়াই করায় সাহস নেই, চুপি চুপি পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমায়। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল মেয়েটা। নিজে কিছু করতে পারবে না. আমাকে করতে হবে। আমি আন্দোলন করি কিনা, তাই বুঝি ভেবেছে একটা আন্দোলন করে ওর বিয়েটা ঠেকাতে পারব!

সাধনা বলে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি তো ভাবছিলাম, মেয়েটার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, বিয়ে হলে হোক না হলে না হোক সব সমান ওর কাছে। তাই তো! বাড়ীতে মুখ ফুটে কিছুই বলে না, আপনাকে গিয়ে ধরেছে!

: বলুন তো? শক্ত মেয়ে হয় পরামর্শ দেওয়া যায়। আত্মীয় বন্ধু হলেও বরং চেষ্টা করা যায়।

সাধনা চুপ করে ভাবে।

সুমতী কথা পাল্টে বলে, প্রভাতবাবুকে আগেই ধমকে দেওয়া উচিত। পাড়ার লোক ডাকতে গেলে রাখালবাবুর আসা চাই কিন্তু।

: রাখালবাবুকে বলবেন।

রাখাল মেলামেশা করে পাড়ার লোকের সঙ্গে কিন্তু হাঙ্গামার ব্যাপারে সে মাথা গলাবে এটা সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না।

সাধনা সোজা গিয়ে হাজির হয় মল্লিকদের বাড়ী। সময় অসময় খেয়াল থাকে না।

শোভা রাঁধছিল।

প্রভা বলে, আসুন, আসুন। এমন সকালবেলা হঠাৎ? রান্না নেই?

: দুটি লোকের আবার রান্না। শোভা কই?

মেজ বৌ বলে, রাঁধছে বুঝি। বসুন না দিদি? বীরেন-বাবুর বৌ আপনার খুব প্রশংসা করে।

সাধনা হেসে বলে, প্রশংসা মানে নিন্দা তো? আমি শোভাকে একটু ডেকে নিতে এসেছি।

: এখন? দরকারটা কি দিদি?

সাধনা নির্ব্বিবাদে মিছে কথা বলে, একটা খাবার করেছি, একটু চেখে আসবে।

চালাক কম নয় সাধনা। অন্য কারণে ডাকলে হয় তো প্রভারাও কেউ সঙ্গে যেত, এমনিই যেত। কিন্তু খাবার খেতে যখন শোভাকে একলা ডাকা হয়েছে, আর কেউ যাবে না জানা কথা, নিরিবিলি সে কথা কইবার সুযোগ পাবে শোভার সঙ্গে।

খাবার অবশ্য সে আনতে দেয় শোভার জন্য। ময়রা

দোকান থেকে তৈরী খাবার। বলে, খাবার খেতে ডাকিনি কিন্তু, তোমার বিয়ের কথা বলতে ডেকেছি। আমার কাছে লুকোবে না কিছু। লজ্জা করবে না।

শোভা মুখ বুজে থাকে।

: তুমি চাও না তো এ বিয়ে হোক?

শোভা একটুখানি মাথা নাড়ে। না-চাওয়াটা যেন তার তেমন জোরালো নয়।

: সত্যিই চাও না, না, শুধু একটু অনিচ্ছার ব্যাপার? যদি ঠেকানো যায় ভালই, না গেলে আর উপায় কি— এ রকম ভাব নয় তো তোমার? চুপ করে থেকো না ভাই, স্পষ্ট করে কথা কও।

: চাই না তো। আমি মানুষ না?

সাধনা খুসী হয়ে বলে, মানুষ যদি তো চুপচাপ আছো কেন? স্পষ্ট জানিয়ে দাও এসব জোর জবরদস্তি চলবে না। তুমি না চাইলে কেউ বিয়ে দিতে পারে তোমার? বাইশ বছর বয়স হয়েছে, এমনিতেই তো তুমি স্বাধীন, আইন দিয়ে তুমি বিয়ে ঠেকাতে পার। সকলে রেগে যাবে, বাড়ীতে অশান্তি হবে, এ ভয়েই যদি মুখ বুজে থাকো, তবে আর তুমি মানুষ রইলে কিসে? একটা বিপদ ঠেকাবে, সে জন্য ঝন্‌ঝাট পোয়াবে না?

শোভার মুখে একটা নিরুপায় হতাশার ভাব দেখা দেয়। একবার সে চোখ তুলে তাকায়। ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে।

: আপনারা বুঝছেন না। সুমতীদিও খালি এই কথা বলছে। জোর করে তো বিয়ে দিচ্ছে না।

: তবে তুমি ভাবছ কেন? মুখ ফুটে জানিয়ে দাও, বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

: আপনি বুঝবেন না। মুখ ফুটে কি জানাব? কি বলব বাবাকে দাদাকে? আমার যে কিছু বলার নেই।

সাধনা খানিক চুপ করে থাকে।

: সত্যি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

শোভাও একটু চুপ করে থেকে বলে, কত বছর ধরে চেষ্টা করছে তো, এর চেয়ে ভাল জুটল না। কোন মুখে বলব এটাও বাতিল করে দাও? যখন জিজ্ঞেস করবে, আমি তা হলে কি করব, আমার গতি কি হবে, কি জবাব দেব?

: বলবে যে তুমি আইবুড়ো থাকবে।

: খাওয়াতে পরাতে পারবে না জানিয়ে দেবে।

: পারতে হবে। কেন তোমায় লেখাপড়া শেখায় নি, মানুষ করে নি?

শোভা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, কি বলছেন? এ কথার মানে হয়? বোনেদের যেমন শিখিয়েছে, যেমন মানুষ করেছে, আমাকেও তেমনি করেছে। অবস্থাটা পাল্টে গেছে বলেই তো, নইলে বাবার কি দোষ, দাদার কি দোষ? পারলে তারা আমার বোনেদের মত আমারও উপায় করে দিত। কী অবস্থা হয়েছে সেটা বুঝি তো। কোন মুখে বলব?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। কঠিন দেখায় তার মুখখানা। শোভাকে খাবার দিয়ে বলে, খেয়ে নাও। খাবার খাওয়াবো বলে ডেকে এনেছি।

শোভা খায় এবং তার খাওয়ার রকম দেখেই বোঝা যায় পেটে তার চনচনে খিদে। আহা, তা হবে না? বাইশ বছরের যোয়ান মেয়ে, তারও যদি না জোরালো খিদে পায়, তবে তো ধরে নিতে হবে মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে নির্বিশেষে মানুষ ডিস্‌পেপ্‌টিক হয়ে জন্মায়।

রাত্রে সবে রাখাল বাড়ী ফিরেছে, প্রভাত সরকারের বাড়ী যাবার জন্য তাকে ডাকতে আসে।

খবর পাওয়া গেছে, আজ শেষরাত্রেই খুব সম্ভব প্রভাতের ভাড়া করা লোকেরা কলোনিতে হানা দেবে। এ বিষয়ে সোজাসুজি কথা বলার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক এখুনি তার বাড়ীতে যাবে।

: যাবে নাকি?—সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

: ঘুরে আসি।

জামা কাপড় না ছেড়েই রাখাল বেরিয়ে যায়।

প্রভাত বাইরের ঘরেই ছিল। বসে বসে কোন বিষয়ে পরামর্শ করছিল তিনজন লোকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বামাচরণকে দেখেই রাখাল চিনতে পারে।

রাজীবের ভক্তির সুযোগ শ'পাঁচেক সিগারেট ধারে বাগাতে সেই যে দোকানে গিয়েছিল, তারপর

লোকটিকে আর ছাখে নি রাখাল। চেহারাটা কিন্তু স্পষ্ট মনে ছিল।

লোকটা যেন বাস্তব জ্ঞানের প্রতীক, তাই একবার দেখলেও অঞ্জনের মত চোখে লেগে থাকে।

পাড়ার জনপনের ভদ্রলোককে এত রাত্রে হঠাৎ তার বাড়ীতে হাজির হতে দেখে প্রভাত বেশ খানিকটা ভড়কে যায়।

: কি ব্যাপার ?

সুমথের বয়স কম, কলেজে পড়ে। সেই মুখ খোলে সবার আগে। বলে, আমরা খবর পেলাম আপনি নাকি ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে এই কলোনির লোকদের পেটাবেন। আমরা তাই এসেছি—

প্রভাত চটে বলে, যেখান থেকে উড়ো খবর পেয়েছ, সেখানে গেলেই হত ?

রাখাল তাড়াতাড়ি ছ'পা এগিয়ে বলে, না না, কথাটা তা নয় প্রভাতবাবু। ছেলেমানুষ ঠিক বলতে পারছে না। কলোনির লোকেরা বলছে, আপনি ওদের মারধোর করে তাড়াবেন বলে শাসিয়েছেন। একটা গুজবও রটেছে যে আপনি নাকি গুণ্ডা ভাড়া করে রেখেছেন। আমরা গুজব শুনেই বিশ্বাস করে ছুটে এসেছি তা নয়। একজন ভদ্রলোক এসব করবেন আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি আপনাকে।

প্রভাত বলে, ও।

সুমথ বলে, অনুরোধ মানে? এই মানুষটার কাছে অনুরোধ মানে?

তার কথা কানে না তুলেই রাখাল বলে, আপনি কলোনির লোকদের উঠে যেতে বলছেন, আমরা চাই না এ নিয়ে কোন হাঙ্গামা হয়। আপনি ওদের বুঝিয়ে হোক, অন্যভাবে হোক চলে যেতে রাজী করাতে পারেন, আমাদের কিছুই বলার নেই। পাড়ার মধ্যে আমরা হাঙ্গামা চাই না।

বামাচরণ প্রভাতের পিছন থেকে বলে, ইনিও কি হাঙ্গামা চান মশাই? আপনারা বাজে গুজব শুনে ব্যস্ত হয়েছেন।

তবে তো কথাই নেই।

ফিরে যেতে যেতে অসন্তুষ্ট সুমথ বলে, একটু শাসিয়ে দেওয়া হল না, কিছু না, অনুরোধ জানিয়ে শেষ হয়ে গেল?

রাখাল হেসে বলে, আবার কি রকম হবে শাসানি? সাবধান, খপর্দ্দার, মাথা ফাটিয়ে দেব, এই সব বললে তুমি বুঝি খুসী হতে? তার চেয়ে দশজন ভদ্রলোকের কাছে নিজের মুখে জানাল ওসব ফন্দি ওর নেই, সব বাজে গুজব, এটা ভাল হল না? এভাবে হাঙ্গামা করার রাস্তা ওর বন্ধ হয়ে গেল না?

বিনয় সেন বলে, ঠিক কথা। এভাবে বলাই ঠিক হয়েছে।

এদিকে প্রভাত জিজ্ঞাসা করে, কি করা যায় হে?

বামাচরণ বলে, নাঃ, ওসব প্ল্যান চলবে না। আপনাকে তো বাস করতে হবে এখানে, পাড়ার লোকদের নিয়ে। অন্য বুদ্ধি করতে হবে।

রাখালের কাছে কিছুই শুনতে হয় না সাধনার। খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণই সে জানতে পারে।

লজ্জায় তার যেন মাথা কাটা যায়!

রাখাল সকলকে সামলে দিয়েছে, ঠাণ্ডা করে দিয়েছে! প্রভাতকে ভাল করে শাসিয়ে দেবার সুযোগ কেউ পায় নি শুধু রাখালের জন্য!

গায়ে পড়ে নেতৃত্ব নিয়ে রাখাল বড়লোক বজ্জাতটার কাছে শুধু অনুরোধ উপরোধের প্যানানি গেয়ে এসেছে। কেউ একটু গরম হয়ে দু'টো কড়া কথা বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে, সকলকে সায় দিতে সে বাধ্য করেছে তার ভীরু সবিনয় নিবেদনে যে প্রভাতবাবু দয়া করে পাড়ার মধ্যে হাঙ্গামা করবেন না!

সুমথ বলে, আর বলবেন না সাধনাদি। আমি একটু শাসাতে গেলাম ব্যাটাকে, রাখালদা আমাকেই শাসিয়ে দিলেন!

যে তীব্র আর অসীম ঘৃণা সাধনা তার চোখে দেখতে পায় তাতে তার চমকে যাওয়ার কথা। কিন্তু সাধনাও আর আগের দিনের ঘরের কোণের সেই জীবটি নেই!

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, সুমতী তোমার কে হয়?

এক মুহূর্ত্ত চোখ পাকিয়ে চেয়ে থেকে সুমথ আচমকা হেসে ফেলে।

: আমার নাম সুমথ, ওর নাম সুমতী, তাই বলছেন? সুমতী আমার কেউ হয় না।

: তোমাদের খুব ভাব দেখি কিনা—

: আমার চেয়ে দু'তিন বছর বয়সে বড়, দু'ক্লাশ উঁচুতে পড়ে।

সুমথ মুখে এমন একটা গম্ভীর ভাব এনে কথাটা বলে যে এবার সাধনা হেসে ফেলে।

: মেয়েরা বয়সে একটু বড় হলে, দু'এক ক্লাশ উঁচুতে পড়লে তাদের সাথে ভাব হতে পারবে না, এমন কোন আইন আছে না কি ভাই?

: তা অবশ্য নেই, ওসব গোঁড়ামিতে আমি বিশ্বাসও করি না। কিন্তু কি জানেন, মেয়েরাই কেমন যেন একটু—

: ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেয়? পাত্তা দেয় না?

সুমথ মুখ লাল করে বলে, আপনি কিছু বোঝেন না। আপনার শুধু ওই এক চিন্তা। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যেন আর কোন রকম সম্পর্ক নেই। আমি কি পাত্তা চেয়েছি যে সুমতী পাত্তা দেবে না?

: আমি কি তোমার কথা বলেছি? আমি সাধারণ ভাবে দশটি সাধারণ ছেলের কথা বলছি। তুমি নয় মহাপুরুষ, তোমার কথা বাদ দিলাম।

সুমথের মুখে যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়।

দেখে সাধানা ভাবে, সেরেছে! ঝগড়া করবে না তো, ছেলেমানুষী বিক্ষোভের ঝড় তুলে? তারপর আবার কান্না সুরু হবে না তো, ছেলেমানুষী দুঃখের কান্না?

কিন্তু সাধনা কি জানে নিজে সে কোথায় আছে আর কোথায় পৌঁচেছে এ যুগের বিদ্রোহী ছেলে!

তাকে অবাক করে দিয়ে বুড়োর মত সুমথ বলে, আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি। আপনি বাঁশঝাড় দেখে বন চিনেছেন। বড় মেয়েদের জন্য অনেক ছেলের পাগলামি আসে বৈকি, নিশ্চয় আসে! অনেক ছেলে মানে কত ছেলে সেটাই আপনি জানেন না। ওরা কোন শ্রেণীর ছেলে সেটাও হিসেব করেন না।

: তাই নাকি!

: তাছাড়া কি? যোয়ান মদ্দ পুরুষের চেয়ে আপনারা এই সব কলেজী ছেলেদের বেশী ভয় করেন—এড়িয়ে চলেন। তাতে এই সব ছেলেরা আরও বেশী করে আপনাদের দিকে ঝোঁকে কি না, আরও বেশী পাগল হয় কিনা, আপনারা তাই ভারি মজা পান, খুসী হন।

সাধনা গালে হাত দেয়।

: কিন্তু ছেলে বলতে আজকাল ওদের আর বোঝায় না সাধনাদি, বুঝলেন? সব ছেলের মধ্যে বড়লোক আর পাতি বড়লোক ছেলে কটা? ওদের মধ্যে বাঁকা রোমান্সের ব্যারামটা ছড়ানো গিয়েছিল বলে সব ছেলে ওই ব্যারামে ভোগে বলা ভারি অন্যায় আপনাদের!

সাধনা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, সত্যি অন্যায়। যে বিষয়ে কোনদিন পাঁচমিনিট ভাবি নি, সে বিষয়ে বড় বড় কথা বলার রোগ আমাদের সত্যি আছে ভাই। হাওয়ায় চড়ে বেড়াই তো আমরা।

তার এই বিনয়ে খুসী হয়ে সুমথ বলে, এবার ভাবছেন তো? ভাবতে হচ্ছে তো আজকাল? তবেই বুঝে দেখুন। আপনারা ঘরের কোণে জীবন কাটান, আপনাদের পর্য্যন্ত এসব না ভেবে উপায় থাকছে না। ছেলেরা কিরকম ভাবনায় পড়েছে ভাবুন তো? কি জানেন সাধনাদি, ছেলেদের দোষ নেই, ছেলেদের বিগড়ে দেবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করা হয়।

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, শুধু ছেলেদের নয় ভাই। পরশুদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। কি ভিড়! সিনেমা দেখে এসে মনে হচ্ছিল, দূর, এভাবে বেঁচে থাকাই মিছে। তার চেয়ে সব কিছু চুলোয়ে দিয়ে মজাদার রংদার কিছু করা যাক।

সুমথ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসে সাধনাকে। বলে, আপনাকেও গেঁয়ো ভাবতাম। মাপ চাইছি।

সাধনা অনুযোগ দিতে রাখাল হেসে বলে, এটা তোমার ছেলেমানুষী গায়ের জ্বালা। মারব কাটব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব—এসব বললেই কি বেশী শাসানো হত? না গালাগাল দিয়ে অপমান করলে বেশী ভয় পেত? দশজনের কথার জোরটা তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা কন

আগে থেকেই ধরে নেব যে আমরা বলার পরেও নিজের মতলব হাঁসিল করার স্পর্দ্ধা লোকটার হবে? আগে থেকে ভয় দেখাতে যাব কেন? তাতে আমাদেরি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেত।

: প্রভাতবাবু শুনবে তোমাদের কথা?

: শুনবে না? ওর এটুকু বুদ্ধি নেই? সবাই বারণ করলে সে কাজটা যে করা যায় না, মূর্খেও এটা বোঝে।

সাধনা যতটা জ্বালা বোধ করেছিল, রাখালের এই সামান্য কয়েকটি কথায় সেটা একেবারে জুড়িয়ে যাবে, এটা যেন তার পছন্দ হয় না। অথচ রাখাল ঠিক কথাই বলেছে—এটা না মেনেও উপায় নেই নিজের কাছে।

সাধনার তাই অন্য একটা জ্বালা আসে।

সে কি রাখালের চেয়ে সব দিক দিয়েই ছোট? বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাস্তব-বোধে আত্মসংযমে কর্ম্মনিষ্ঠায়—মনুষ্যত্বে? মানুষ হিসাবে রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার কথাটা জীবনে আজ প্রথম মনে আসে সাধনার। বেকার রাখালের সঙ্গে এতবড় প্রচণ্ড সংঘাত গেল, ভেঙ্গে প্রায় চুরমার উপক্রম হল তাদের জীবন—কিন্তু তখনও এরকম তুলনা-মূলক আত্মসমালোচনার চিন্তা তার খেয়ালেও উঁকি মেরে যায় নি।

সে শুধু বিচার করেছে রাখাল কেমন মানুষ, কেমন স্বামী।

ভাঙ্গনটা সামলে নেবার পর আত্মসমালোচনা অবশ্যই এসেছে। নিজের কতগুলি বড় বড় দোষ আর ভুল সে

আবিষ্কার করেছে নিজেই। নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে যে দোষ কেবল রাখালের একার ছিল না, নিজেও সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধৈর্য্য হারিয়েছিল, নিজের সুখ দুঃখ অর্থাৎ স্বার্থটাই সব চেয়ে বড় করে ধরেছিল।

কিন্তু রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নি।

মানুষ হিসাবে তুলনা।

মানুষের যেগুলি গুণ, মানুষ হিসাবে যাতে পরিচয় মানুষের, রাখালের সঙ্গে নিজের সেই গুণগত তুলনা। কোন গুণটা তার বা রাখালের আছে বা নেই, কোন গুণটার বিকাশ কতখানি হয়েছে তার আর রাখালের মধ্যে।

একটু ভেবে দেখবার অবসরের চেয়ে প্রাণটা যেন ছটফট করে সাধনার।

এদেশের মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সে তা জানে এবং মানেও। রাখালের তুলনায় সে কোনদিক দিয়ে কতখানি পিছিয়ে আছে একান্তে একটু হিসাব করে দেখার জন্য তার যেন ধৈর্য্য ধরে না।

কিন্তু সারাদিন খেটেখুটে শ্রান্তক্লান্ত মানুষটা বাড়ী ফিরেছে, জামাকাপড় ছেড়ে পাঁচ মিনিট একটু বিশ্রাম করছে—এখন ওকে এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া, আসন পেতে রুটি বেড়ে খেতে দেওয়া আর মন বুঝে ঘুমানোর আগে একটু গা ঘেঁষে যাওয়া ইত্যাদি কর্ত্তব্যগুলি পালন না করে নিজের চিন্তা নিয়ে মসগুল সে কোন হিসাবে হয়?

যার খাচ্ছে যার পরছে যার ভাড়া করা ঘরে মাথা গুঁজে

আছে, মানুষ হয়ে তার জন্য একটু না করলেই বা চলে কি করে ?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও আদান-প্রদানের একটা বাস্তব নিয়মনীতি আছে তো !

মন কিন্তু মানে না।

জ্যোস্না ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। রুটির থালা সাজিয়ে আনতে রান্নাঘরে যেতে যেতে উঠানটুকুতে যে জ্যোস্না পড়েছে সেদিকে তাকাতেও যেন ইচ্ছা হয় না, চোখ উঠে যায় জ্যোস্নায় আলোকিত ওই আকাশে। সাধনাও ভাবে যে এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ? অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে জ্যোস্নাভরা রাত্রির তফাৎ তো এই যে পৃথিবীর ঘরবাড়ী মাঠ পুকুর গাছপালা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর পূর্ণিমার চাঁদের আলো মাখা রূপ নিয়ে ধরা দেয় চোখে—চোখ কেন পৃথিবীকে বাতিল করে আকাশে জ্যোস্নালোকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয় ?

মেঘ আর চাঁদের আলোয় মেশানো শোভা হোক, অথবা নির্মেঘ আকাশের শোভা হোক ?

বাইরে কড়া নড়ে।

রুটির থালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে সাধনা শুধোয়, কে ?

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বামাচরণ বলে, প্রভাতবাবু এসেছেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দুটো কথা কইবেন।

একমুহূর্ত্ত ভাবে সাধনা।

প্রভাত বাবুরাই কি তবে তাকে একান্তে একটু চিন্তা করার ছুটি এনে দিল ?

অথবা কর্ত্তব্য হিসাবে দরজা না খুলেই এদের বলবে, একটু দাঁড়ান, উনি খেতে বসেছেন, আসছেন ? বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত রাখালের সামনে রুটি তরকারীর থালাটা ধরে দিয়ে সে খেতে আরম্ভ করলে ধীরে সুস্থে বলবে যে বাইরে কে বুঝি তোমায় ডাকছে ?

শ্রান্তি ?

ক্লান্তি ?

ক্ষুধা ?

চুলোয় থাক সব !

সাধনা দরজা খুলে দেয়।

বলে, আসুন।

ভরা জ্যোস্নায় তার দিকে চেয়ে প্রভাত যেন থতমত খেয়ে ভড়কে যায় !

আমতা আমতা করে বলে, রাখালবাবু আছেন ?

তখন খেয়াল হয় সাধনার। হায়, ছুটি পাবার আশায় দিশে হারিয়ে সে একেবারে ভুলে গেছে যে সে তার বৌয়ের চাকরীতে ডিউটি করছে। আশারা শুয়ে পড়েছে দরজায় খিল দিয়ে। সায়া ব্লাউজ খুলে ফেলে রেশন-মার্কা সুপারফাইন নতুন শাড়ীটা শুধু গায়ে জড়িয়ে সে রেশনের গমভাঙ্গা রুটি আর আলুপেঁয়াজের তরকারী থালায় নিয়ে খেতে দিতে যাচ্ছিল রাখালকে।

কিন্তু ভুল হয়ে গেছে, উপায় কি।

একটু দাঁড়ান, আমি ভদ্রমহিলা সাজি, বলে' তো আর এদের সামনে সায়া ব্লাউজ গায়ে চড়ানো যায় না!

সাধনা স্পষ্ট সহজ ভাবে বলে, ভেতরে আসুন, উনি ঘরে আছেন। খেতে বসেছেন।

বলে' সে নিজেই এগিয়ে যায়। তার নিজের হাতে তৈরী পাশাপাশি লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা তার স্বরস্বতীর বাহন হাঁস আঁকা আসনে উপবিষ্ট রাখালের সামনে থালাটা নামিয়ে দেয়।

বলে, প্রভাতবাবুরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন।

বলে', প্রভাত আর বামাচরণকে ডেকে বলে, আসুন, ঘরে আসুন। চেয়ার টেয়ার নেই, খাটেই বসুন দু'জনে। উঠছ কেন তুমি? খেতে খেতেই কথা বল না এঁদের সঙ্গে।

বাইরে সাধনার বিছানার চাদরটা শুকোচ্ছিল, সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়।

আশা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কে এল?

সাধনা একটু গর্ব্বের সঙ্গেই বলে, প্রভাতবাবু ওর সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন। কলোনির ব্যাপার নিয়ে বোধ হয়।

এতই আত্মসচেতন হয়েছে সাধনা আজকাল যে আশার কাছে এই গর্ব্বপ্রকাশ তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে ভাবে, আমার হয়েছে কি? কি নিয়ে আমি ফুটানি করলাম আশার কাছে?

প্রভাতের মত লোক তাদের বাড়ীতে এসেছে বলে অথবা পাড়ার মধ্যে রাখাল নেতার সম্মান পেয়েছে বলে তার অহঙ্কার—সাধনা বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ হাতে খেলনা পাওয়ার মত দুটো কারণেই যে বুকটা হঠাৎ তার বেশ একটু ফুলে উঠেছে, নিজেকে এতটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য সাধনার জন্মে নি।

তা হলে অনেক সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কাছে, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত।

তার আত্মচিন্তা আর আত্মসমালোচনাও যে কোন চেতনার প্রক্রিয়ার পাক খাচ্ছে সেটা ধরা পড়ে যেত তার কাছে। রাখালের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে ছোট মনে হবার বদলে কি যে তাকে পিছনে কোথায় ঠেলে রেখে দিয়েছে সেটা জানতে পারত।

কি কথা হয় শোনার জন্য আশাও দরজার কাছে তার পাশে দাঁড়ায়।

প্রভাত বলে, অসময়ে এসে আপনাকে আমরা বিরক্ত করলাম। আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন।

রাখাল বলে, খাব'খন, সেজন্য কি। মেয়েদের বুদ্ধি তো, দু'জন ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছেন, পরে খাবারটা দিলেই হয়। বলে গেলেন, রুটি চিবোতে চিবোতে কথা বল। ভাত হলে তবু তাড়াতাড়ি গেলা যেত।

রামাচরণ বলে, তা যা বলেছেন দাদা। রুটি চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। ক'বছর বাদে দেখবেন

বাঙালীর মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। রোজ মুখের নতুন রকম ব্যায়াম হচ্ছে তো!

বলে সে সশব্দে হাসে।

প্রভাত বলে, তাহলে আর আপনার দেরী করিয়ে লাভ নেই, কথাটা সেরে ফেলা যাক। সেদিন আপনারা দশজনে গেলেন, সকলের সামনে আর তর্কের কথা তুললাম না। আপনারা ধরে নিয়েছেন, গোলমাল বুঝি আমিই করতে চাই। আমার মশাই হাঙ্গামা করে লাভ? সে দিনকাল কি আর আছে যে জমিদারী দাপটে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেব? কথাবার্ত্তা বলে ন্যায়সঙ্গত একটা মীমাংসা হোক, তাই তো আমি চাই।

রাখাল বলে, সেটাই তো ভাল কথা।

: আপনারা সেদিন আমায় বলে এলেন, হাঙ্গামা যেন না হয়। হাঙ্গামা করার কথা আমি ভাবিও নি। কিন্তু এদিকে কলোনির লোকেরা যে আমায় পিটোবে বলে শাসাচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখছেন না?

: সে কি কথা? কলোনির লোকেরা যদি গোলমাল করে, আমরা দশজনে ওদেরও নিশ্চয় শাসন করে দেব।

সাধনা চুপ করে থাকতে পারে না।

ভিতরে গিয়ে সোজাসুজি প্রভাতকে বলে, কিন্তু ওরাই বা মিছিমিছি আপনাকে পিটোতে চাইবে কেন প্রভাত বাবু?

বিছানার চাদর জড়ানো ঘরের বৌকে কলোনিবাসীর পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়াতে দেখে প্রভাত একটু ভড়কে যায়।

ভার হয়ে বামাচরণ বলে, সেই কথাই বলছি আমরা। উচিত কি অনুচিত বিচার করবে না, কোন কথা শুনবে না, ওদের জিদ বজায় রাখবে। এইখানে জমি দখল করে থাকবে, আর কিছু বিবেচনা করতে রাজী নয়। নড়তে বললে মাথা ফাটিয়ে দেবে, মারামারি করবে।

: ওরাই বা কোথায় যায় বলুন? একবার নিরাশ্রয় হয়েছিল, কুঁড়ে ঘরে মাথা গুঁজে আছে। আবার কি নিরাশ্রয় হতে বলেন ওদের?

: ওই তো মুস্কিল, ওরাও ঠিক এমনি একগুঁয়ের মত কথা বলছে। আমরা ওদের নিরাশ্রয় হতে বলছি কি বলছি না—

: যেখানে উঠে যেতে বলছেন, সেখানে মানুষে থাকতে পারে না।

বামাচরণ অসহায়ের মত একটা নিশ্বাস ফেলে। গভীর আপশোষের সঙ্গে বলে, আপনিও সব কথা না শুনেই একটা সিদ্ধান্ত করে বসছেন—কি আর বলা যায় বলুন?

রাখাল এবার বিরক্তি জানিয়ে সাধনাকে বলে, তুমি আবার তর্ক জুড়লে কেন? ওরা কি বলছেন শোনা যাক আগে?

সাধনা চুপ করে থাকে।

বামাচরণ প্রভাতের দিকে তাকায়।

প্রভাত বলে, তুমিই বল।

বামাচরণ বলে, দেখুন, এ ভদ্রলোককে আপনারা একেবারে

ভুল বুঝেছেন। কলোনির লোকেরাও ভুল বুঝেছে, আপনারাও ভুল বুঝেছেন। কলোনির ওদের ও জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা এঁর মতলব নয়, ইনি যে প্ল্যান করেছেন সেটা ওদেরও মঙ্গলের জন্যই। এঁর কি স্বার্থ নেই? নিশ্চয় স্বার্থ আছে, শুধু ওদের মঙ্গল করার জন্যই ইনি প্ল্যানটা করেন নি। এঁর স্বার্থও বজায় থাকবে, কলোনির ওদেরও একটা স্থায়ী ভালো ব্যবস্থা হবে—এই জন্যই এঁর এত উৎসাহ।

: প্ল্যানটা কি?

বামাচরণ ধীরে ধীরে বাখ্যা করে শোনায়। আসল ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয় কিন্তু সে এমনভাবে বলে যেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে শ্রোতা দুজনের মাথায় ঢুকবে না।

কলোনির জমিতে প্রভাত একটা কারখানা গড়বে। ষ্টোভ, ল্যাম্প, লোহার উনান, বালতি ইত্যাদির কারখানা। কারখানার সঙ্গে সে তৈরী করবে খাটুয়েদের বসবাসের জন্য বড় একটা ব্যারাক। এই কারখানায় সে কাজ দেবে কলোনির লোকদের—যতজন কাজ করতে চায়। ব্যারাকের পাকা ঘরে তারা বাস করতে পাবে।

বামাচরণের ব্যাখ্যা শুনতে প্রভাত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মুখপাত্র থামতেই সে বলে, ফ্যাক্টরীর প্ল্যানটা আমার, অনেকদিনের লাইসেন্স নেওয়াই আছে। এইসব মানুষগুলির কথা ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল যে ফ্যাক্টরীটা ষ্টার্ট

করে দিলে এদেরও আমি একটা হিল্লে করে দিতে পারি তখন ভাবলাম, তা হলে আর দেরী করা উচিত নয়। এখানে আর ক'জন লোক থাকে? সকলেই অবশ্য ফ্যাক্টরীতে আসবে না, কেউ কেউ এদিক ওদিক অন্য কাজে ভিড়ে গেছেন। বেশীর ভাগ লোককেই আমি কাজ দিতে পারব—বরং আরও লোক আমার দরকার হবে।

বামাচরণ বলে, বাইরের লোক কিছু নিতে হবেই। এরা সবাই আনাড়ি—কাজ শেখাতে হবে। কিছু কাজ-জানা লোক ছাড়া তো ফ্যাক্টরী চলবে না।

রাখাল বলে, আপনার এ প্ল্যানের কথা তো কেউ শোনে নি প্রভাতবাবু?

: শুনতে না চাইলে কাকে শোনাবো বলুন? ওদের বলতে গেলাম, তোমাদেরি ভবিষ্যতে উপকার হবে, ছ'মাস আট মাসের জন্য জমিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য যাগায় থাকবে যাও। শুনেই সকলের মেজাজ গরম—তাড়াবার চেষ্টা করলে আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে! কাকে কি বলব বলুন?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, ওদের যেখানে যেতে বলছেন, কারখানটা সেখানে করুন না?

বামাচরণ একটু হাসে।

: কর্তারা ওখানে করতে দেবেন না। ওখানে কি সব করা হবে, পাঁচসাত বছর পরে প্রভাতবাবুকেই ছেড়ে দিতে হবে জমিটা। টেম্পোরারি শেড ছাড়া ওখানে কিছু তোলার হুকুম নেই। বুঝলেন?

সাধনা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কী যে সব গোলমেলে ব্যাপার।

বামাচরণ সায় দিয়ে বলে, আর বলেন কেন! গবর্ণমেণ্টের কোন কাজের মানেটা আমরা বুঝতে পারি? সব গোলমেলে ব্যাপার।

বামাচরণের মুখে গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা শুনে সাধনা কি বলবে ভেবে পায় না।

রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, সত্যই যদি আপনি এটা করতে চান প্রভাত বাবু—

: সত্যই চাই মানে—?

রাখাল শান্তভাবেই বলে, ওভাবে নেবেন না কথাটা। আমি বলছি দশজনকে কনভিন্স করানোর কথা। আপনার প্ল্যান খুব ভাল, সকলের খুসী হয়ে মেনে নেবার কথা। কলোনির ওরা এত কষ্ট করছেন—কয়েকটা মাস একটু খারাপ যাগায় গিয়ে থেকে যদি ভবিষ্যতের উপায় হয়, ওরা এক কথায় রাজী হবেন। কিন্তু বোঝেন তো, নানা লোকের মনে না না প্রশ্ন জাগবে। আপনি যদি শেষ পর্য্যন্ত কিছু না করেন—

প্রভাত বলে, তা হলে আর মীমাংসা কি করে হবে বলুন? আমি কারখানা দেব, ওঁরা আমার জমি আটকে রাখবেন, এতো আর হয় না! আমি বাধ্য হয়েই যেভাবে পারি ওদের তুলে দেবার চেষ্টা করব।

রাখাল বলে, সকলকে যদি ডাকা যায়, আপনার কথাটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে রাজী আছেন? কারখানায়

ওদের সকলকে কাজ দেবেন, ব্যারাকে থাকবার ব্যবস্থা করবেন—এসব জানিয়ে দেবেন ?

: নিশ্চয় !

প্রভাত ও বামাচরণ চলে যাবার পর রাখাল খেতে বসলে সাধনা বলে, তুমি কত বড় একটা দায়িত্ব নিলে বুঝতে পারছ ?

: আমার কি দায়িত্ব ?

: তুমিই তো ডাকবে সকলের মিটিং ? তোমার সেই মিটিংয়েই তো প্রভাতবাবু তার প্ল্যানের কথা বলবেন আর ওদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে ? তোমাকে দায়ী করবে না লোকে ?

মুখের চিবানো রুটি গিলে রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, তাই তো !

আজ সে আচমকা টের পায় যে দশজনের ব্যাপারে এগিয়ে গেলে দায়িত্ব এসে চাপবেই।

সে হয়তো স্থির করবে না কিছুই, কি করা উচিত বা অনুচিত কোন পরামর্শই হয় তো দেবে না, শুধু প্রভাতের প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য অগ্রণী হয়ে দশজনকে একত্র জড়ো করাবে।

তবু, সেই দশজনের জমায়েতে যে সিদ্ধান্ত হবে তার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব থাকবে তার।

কেন সে দশজনকে জড়ো করতে এগিয়ে গিয়েছিল ? চুপচাপ গা বাঁচিয়ে না থেকে কি তার প্রয়োজন হয়েছিল

দশজনের ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার? নিজের কাজ করে যাক্ আর চুপচাপ নিজের ঘরের কোণে বসে থাক—কেউ তাকে কোন বিষয়ে দায়ী করবে না।

কিন্তু দশজনের ব্যাপারে এক পা এগোলে দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না।

দশজনের ভালমন্দ তো ছেলে খেলা নয় যে দায়িত্ব এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে ভাল করতে আসরে নামা যাবে।

নাম কেনা যাবে সস্তায়!

সাধনা তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলে, ছ্যাখো, একার বুদ্ধিতে কিছু করা আমার মত নয়। মিটিং ডাকার কথাটা প্রভাতবাবুদের বলা তোমার উচিত হয় নি। আগে পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর ভাল মনে করলে জানালেই হত। তুমি হুট করে মিটিং ডাকার দায়িত্বটা নিয়ে বসলে!

: তুমি থামো। দোহাই তোমার!

: কেন, অন্যায় কথাটা কি বললাম?

: অন্যায় কথা বলো নি। আমায় একটু রেহাই দাও।

মেজাজ বিগড়ে গেছে রাখালের! তার দায়িত্বের কথাটা সাধনা মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলে নয়—মনে পড়িয়ে দিয়ে সমালোচনা জুড়েছে বলে। চুপ করে থাকলে রাখালের রাগ হত না। জের টেনে উপদেশ দিতে আরম্ভ করায় সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের।

কারণ, সাধনার কথাগুলি যেমন ঠিক, তেমনি বেঠিকও

বটে। একথা সত্য যে একার বুদ্ধিতে কাজ করা ভাল নয়—কিন্তু তাই বলে কখনো কোন অবস্থায় কেউ কোন ব্যাপারে নিজের বুদ্ধিতে দায়িত্ব নেবে না, তাহলেই বা চলে কি করে?

দায়িত্ব যদি সে নিয়ে থাকে, নিয়েছে। সেজন্য এত সমালোচনা করা ও উপদেশ ঝাড়ার দরকার কি সাধনার? এই হল রাখালের রাগের কারণ।

অবশ্য মনটাও তার ভাল ছিল না; শরীরটাও ছিল খুব শ্রান্ত।

রান্নাঘরে হেঁসেল গুছানোই ছিল। তবু সেখানেই যায় সাধনা। আর কোথাও গিয়ে একটু একা হবার যায়গা তার নেই।

সে শুধু ছোট নয়। রাখালও তাকে ছোটই ভাবে। আজ তার চরম প্রমাণ মিলেছে। ঘর সংসার বা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ স্বার্থের কথা নয়। কলোনির মানুষগুলি সম্পর্কে তার আগ্রহের খবর রাখাল রাখে। ওদের ভালমন্দের প্রশ্ন নিয়ে ঘরোয়াভাবে তার সঙ্গে আলাপ করতে রাখাল নারাজ নয়—শুধু এ প্রশ্ন কেন, দাম্পত্য আলাপ-আলোচনার স্তরে দেশ বিদেশের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে রাখালের আপত্তি হয় না।

কিন্তু কলোনির ওই মানুষগুলির বাস্তব প্রত্যক্ষ সমস্যা নিয়ে দাম্পত্যালাপের বদলে সমালোচনা ও পরামর্শ সুরু করা মাত্র ছোট মুখে বড় কথা শুনেই রাখালের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে।

প্রভাত ও বামাচরণকে সরাসরি ঘরে এনেছিল বলে রাখাল বিরক্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, মেয়েমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে। বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু রাগ করে নি। এখন সাধনা বুঝতে পারে রাখালের রাগ হয়েছিল তখন যখন সে যেচে মাথা গলিয়েছিল তাদের আলোচনায়, সরাসরি প্রভাতকে প্রশ্ন করেছিল, তর্ক জুড়েছিল।

আরও একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে সাধনার কাছে।

পাড়ায় এত লোক থাকতে প্রভাতেরা তাদের ঘরে এসেছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে—আশার কাছে এজন্য রীতিমত সে গর্ব্ব বোধ করেছিল।

গর্ব্ব সে একাই বোধ করে নি।

রাখালের কাছেও এ একটা স্মরণীয় ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেতা হিসাবে গণ্য হবার অভিমানের স্বাদ পেয়েছে রাখাল—প্রভাত ও কলোনিবাসিদের সংঘাতের একটা মীমাংসা করার দায়িত্ব পেয়ে সে সুখী বই অসুখী হয় নি।

তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে সে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। আসলে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্য রাখালের দুশ্চিন্তা জাগে নি। কিভাবে সে কি ব্যবস্থা করবে এসব কথাই সে ভাবছিল গভীরভাবে।

দুর্ভাবনায় নয়, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট দেখাছিল তার মুখ।

এ ব্যাপারে রাখাল এগিয়ে যাবে। কিন্তু তার উপদেশ ও পরামর্শ শুনতে সে রাজী নয়।

অথচ কাজে রাখাল সাধনার উপদেশ অনুসারেই চলে। সাধনা তাকে অন্যের সাথে পরামর্শ করতে বলেছিল এটা অবশ্য খেয়াল না রেখেই।

নিজেই সে হিসাব করে। এবং হিসাব করে পরদিন সকালে যায় সুমতীর কাছে।

সুমথ তখন সুমতীর কাছে সাধনার সঙ্গে তর্কাতর্কির গল্প করছিল।

সুমতী খুসীতে গদ গদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে না বলে রাখাল একটু ক্ষুণ্ণ হয়।

সুমথের উপস্থিতিটা তার পক্ষে বরদাস্ত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুমতী বলে, আসুন রাখালবাবু। সকালবেলাই যে?

ঃ একটু দরকারী কথা ছিল।

বলে সে সুমথের দিকে বিশেষভাবে তাকাতে আরম্ভ করতে না করতে সুমথ যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঃ কি কথা বলুন?

সব কথা খুলে বলার ইচ্ছা রাখালের ছিল না। সুমতীকে মোটামুটি প্রভাতের প্ল্যানের কথা জানিয়ে মিটিং ডাকতে তার সাহায্য চাইবে ভেবেছিল।

কিন্তু সুমতীর সঙ্গে পারা দায়।

সে জেরা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে নেয়।

তারপর মন্তব্য করে, ওদের কোন মতলব আছে। নইলে এ প্ল্যানের কথা অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছিল কেন? ওদের

তো নিশ্চয় জানাত, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের তাড়াচ্ছি!

রাখাল বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

: তবে মিটিং ডাকার ভার নিলেন কেন?

সুমতী শুধু প্রশ্ন করেছে। সাধনা স্পষ্ট নিন্দা করেছিল। কিন্তু দু'জনের কথার স্বর যেন একই।

রাখাল ভেবে চিন্তে বলে, মিটিং ডাকাই তো ভাল? আগে ওদের অন্যরকম মতলব ছিল, সে তো জানা কথাই। জোর জবরদস্তি করে সকলকে ভাগাবার ফিকিরে ছিল। কিন্তু যাই হোক, সে সব মতলব তো ছাড়তে হয়েছে। এখন সকলের সামনে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে কারখানা গড়বে, সকলকে কাজ দেবে—খানিকটা করতে হবে নিশ্চয়। একেবারে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে না।

: ওদের বিশ্বাস কি?

: কিন্তু আর কি করার আছে বলুন? এভাবে তবু ওদের খানিকটা বাঁধা যাবে, ওদের নিজেদের কথায়। কিছু না করে পারবে না কলোনির লোকদের জন্য। অন্যদিকে দেখুন, ওদের এ প্ল্যানটা না মানলে ওরা কি ছেড়ে কথা কইবে? যেভাবে পারে কলোনির লোকদের তাড়াবেই। গুণ্ডা লাগাবে, পুলিশ আনবে—

: সেই ভয়ে—?

: ভয়ে নয়। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। আপনি আমি প্রাণপণ করেও ওদের কি রাখতে পারব এই জমিতে?

ধরুন, আপনি আমি রক্ত দিয়ে ওদের ওখানে রাখলাম, কুঁড়েগুলি টিঁকিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর? দু'চার হাত জমিতে হোগলার ঘর তুলে বুনো অসভ্যের মত ওদের জীবন কাটবে, এটাই কি আমরা চাই? প্রভাতবাবুর জমিতে এভাবে মাথা গুঁজে থেকেই কি এদের মোক্ষলাভ হবে? মানুষ হয়েও এরকম অমানুষের মত বাঁচার জন্যই কি এরা লড়াই করবে, আর আমরা সেটাই আদর্শ বলে ধরে নেব?

সুমতী চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, ভিখারীরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা না দিলে ভিখারিরা বাঁচবে না, সকলে ওদের ভিক্ষা দিন—এই বলে কি আমরা আন্দোলন করব? কলোনির ওরা বিপাকে পড়েছে সত্যি। কিন্তু আমরা কি কলোনিটা কোন রকমে বজায় রাখতে আর সব ভুলে গিয়ে প্রাণ দেব? এদিকে যে দুর্ভিক্ষে লাখ লোক মরছে?

সুমতী বলে, আপনি আমাব মাথা ঘুরিয়ে দিলেন।

রাখাল বলে, মাথা আমারও ঘুরছে! রামরাজ্যে হনুমান না হয়ে মানুষ হতে চাইলে মাথা ঘুরবেই।

পাড়ার দু'চারজনের সঙ্গে রাখাল কথা বলে।

বীরেন ছাড়া বাকী ক'জনেই আপিস-গামী মানুষ। একেবারে ঘড়ব কাঁটায় বাঁধা জীবন—বাসে দারুণ ভিড় হয় বলে কত মিনিট বাড়তি সময় রিজার্ভ রাখা দরকার তাও হিসাবে বাঁধা। রাখাল সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে, তারাও

অল্প কথায় সায় দেয়। রাখাল দায়িত্ব নিয়ে যা করবে তাতেই তাদের সমর্থন আছে।

দোকান বাজার রেশন ইত্যাদি জরুরী কর্ত্তব্য সারতে হবে আফিস যাওয়ায় আগে, বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই।

রাখাল আর সে রাখাল নেই। আগে সে ভেবে বসত যে সবাই এরা গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়, গণ্ডগোলে কাজ নেই! কিন্তু আজ সে জানে যে এরা বড়ই বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত কিন্তু কেবল সেইজন্য সমর্থন জানিয়ে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এটা নয়।

তাকে এরা বিশ্বাস করে। এরা জানে এ ব্যাপারে তার নিজের কোন স্বার্থ নেই। ভুল সে করতে পারে কিন্তু কোন রকম মতলব হাঁসিল করার বজ্জাতি তার দ্বারা সম্ভব হবে না।

এটুকু বিশ্বাস যাকে করা যায় না তেমন কেউ এলে এদের রকম যেত বদলে, অগ্রিম ঢালাও সমর্থন জানিয়ে দেবার পরিবর্ত্তে একেবারে অন্যভাবে অন্য ভাষায় কথা বলত!

বিনয় যেন প্রায় কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলে, হ্যাঁ দাদা, আপনি একটু লাগুন, হাঙ্গামা টাঙ্গামা যাতে না হয় দেখুন। আমরা আপনার সাথে আছি।

বাড়ীওলা বীরেনের অনন্ত অবসর। সময় কাটতেই চায় না—অতি ভোগে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভোগশক্তির ভোঁতা মন্থর দিনগুলি কাটানোই তার দারুণ সমস্যা।

রাখালকে সে যেন আঁকড়ে ধরে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

সে যেন জানার চেষ্টা করে রাখালও যা জানে না, কতরকম যে মন্তব্য করে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

রাখাল শেষে ধৈর্য্য হারিয়ে বলে, প্রভাতবাবু আর বামাচরণ তো আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন দত্তমশাই। আপনি তো সবই জানেন?

অন্য লোকে লজ্জা পেত কিন্তু লজ্জাসরম সবই ভোঁতা বীরেন দত্তের।

: আহাঃ, সেই জন্যেই তো, সেই জন্যেই তো! ওরা একরকম বলে গেল বলেই তো জানতে চাইছি আসল ব্যাপারটা কি। আপনি তো আর মিছে কথা কইবেন না? আপনার স্বার্থ কি?

ভিজে কাপড়ে বিশ-বাইশ বছরের একটি মোটাসোটা মেয়ে এসে বলে, বাবা, আদ্দেক নাইতে নাইতে কল বন্ধ করে দিলে।

ক্রোধে লতিকার বিস্ফারিত চোখমুখ—দেহের গড়ন যেমন হোক মুখখানা প্রতিমার মুখের মত সুন্দর—দিশেহারা রাগে এখন অবশ্য কুৎসিৎ দেখাচ্ছে। সাবানের ফেণা লেগে আছে গলায় আর কেঁধে পিঠে।

: কে বন্ধ করলে? ব্যাটাছেলে?

: না। অঞ্জলি। বললে কি জানো? ওপরের কলে নিজেদের কলে নাইবে যাও—এসব ট্যাকটিক্স আমরা জানি। আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কলে বালতি বসালে। ট্যাকটিক্স মানে কি বাবা?

অন্তরীক্ষ থেকে মেয়েলি গলায় মন্তব্য আসে—সকলকে শোনানোর মত জোর গলায় মন্তব্য : টিপ টিপ জল পড়ে কলে,বালতি ভরতে আধ ঘণ্টা লাগে, উনি নিজেদের কল ছেড়ে আধঘণ্টা ধরে নাইতে এসেছেন। এসব মতলব আমরা যেন বুঝি নে !

বীরেন সখেদে বলে, বাড়ী বলুন, জমি বলুন, ভাড়া দেওয়া ঝকমারি মশায়! দেশের আইন হয়েছে তেমনি। যে দখল করেছে তারি দখলীসত্ব !

রাখাল হেসে বলে, না মশাই, না। তা হলে তো সত্যিকারের রামরাজ্য হয়ে যেত। জমিটমি সব জমিদার জোতদারেরি আছে—যারা চাষ আবাদ করে, তারা কি আর দখলীসত্ব পেয়েছে জমিতে? বাড়ীভাড়ার আইন তো আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মশায়।

বীরেন দত্ত কথাটা বুঝতে একটু সময় নিতে চায়। তার মোটাসোটা মেয়েটা এতক্ষণ ভিজে কাপড়টা টেনেটুনে লজ্জা করার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করতে করতে ফোঁস করে বলে, আমাদের বাড়ী, বাবা গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বাড়ী করেছে, দূর হয়ে যেতে বললে যায় না কেন ইয়ের ব্যাটাব্যাটিরা ?

: কেন যাবে ? ভাড়া তো দিচ্ছে।

: ভাড়া চাইনে। দয়া করে দূর হয়ে যাক।

বীরেন দত্ত এতক্ষণে মুখ খোলে, খক্ খক্ করে কাসতে কাসতে হাত তুলে তাদের বাজে তর্ক থামাতে বলতে বলতে দিশেহারার মত হঠাৎ উঠে গিয়ে রঙীন কাঁচের আলমারি

খুলে কি একটা ওষুধ মুখে পুড়ে দেয়। আস্তে আস্তে কাসিটা থামে।

: কি বলছিলেন কথাটা? বাড়ীভাড়া আইনটা না হলে আমরা বাড়ীওয়ালারাই মারা পড়তাম?

: পড়তেন বৈকি! আপনাদের লোভের সীমা নেই, লিমিট রাখতেন না, বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। ফলটা হত উল্টো।

: কি রকম?

: মানুষ ক্ষেপে যেত। যতটা শোষণ করতে পারছেন তাও পারতেন না। শোষণ করারও রীতিনীতি আছে তো? একটা সীমা বজায় রাখতে হয়। আপনাদের লাভ ঠেকাবার জন্য নয়, অসম্ভব লোভ করতে গিয়ে আপনারা পাছে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেন, সেটা ঠেকাবার জন্য আইন হয়েছে।

বীরেন দত্ত বাঁকা হাসি হাসে।

: আপনাদের কি আর বলব মশাই, আপনারা নাকের ডগাটি শুধু দেখতে পান! বলি, লিমিট বজায় রাখার জন্যই যদি আইন, শুধু বাড়ীভাড়ার বেলা এত কড়াকড়ি কেন? চোরা কারবারের লাভে বুঝি লিমিট লাগে না? কাপড়ের লাভে? চিনির লাভে?

: ওসব অব্যবস্থা—

: ওসব অব্যবস্থা থাকতে পারে—বাড়ীভাড়ার বেলাতেই ব্যবস্থাটা জরুরী হয়ে উঠল! ওই যে বললাম, নাকের ডগা

ছেড়ে আপনাদের চোখ চলে না ! বাড়ীওলারা যদি লাখপতি কোটিপতি হত, তাহলে আর এ আইনের বালাই থাকত না। মুনাফা যারা লুটছে তারা বাড়ীভাড়ার পিত্যেশ করে না। ইয়া বড় বড় বিল্ডিং-এ কটা প্রাণী বাস করে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশটা ভাড়াটে বসাতে পারে,—বসায় ?

লতিকা ফোঁড়ন কাটে, কেন ওঁর সঙ্গে তর্ক করছ বাবা ? উনিও ভাড়াটে—বাড়ীওলাদের খারাপ ছাড়া ভাল ভাবতেই পারবেন না। উনি ভাড়াটাই দেখবেন—বাড়ী করতে কত খরচ হয় সে হিসেব তো ধরবেন না !

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রাখাল। কলোনির দিকে চলতে চলতে ভাবে, বাড়ীওলারা কি মাঝারি আর ছোট ব্যবসায়ীদের দশায় পড়েছে ? এদিকটা চিন্তাই করা হয় নি একেবারে !

সাধনাকে ঘিরে বৈঠক গড়ে উঠেছে কলোনির অধিকাংশ লোকের আর সাধনার অদম্য সাধ জাগছে রাখালের কিছু করার আগেই প্রভাত আর বামাচরণের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিতে।

কিন্তু মুস্কিল এই, চক্রান্তটা কি সে ঠিক জানে না।

সকলে যখন প্রশ্ন করবে সে জবাব দেবে কি ?

রাখালের সঙ্গে প্রভাতদের পরামর্শের কথা উল্লেখ না করে

সে তাই ভাসা ভাসা ভাবে তাদের সতর্ক করে দেয়, সবাই সাবধান থাকবেন কিন্তু। ভাববেন না শুধু গায়ের জোরে আপনাদের ভাগাবার চেষ্টা করবে। নানা রকম ফন্দিফিকিরও করবে, ভালো মানুষ সেজে এসে ভাঁওতা দেবে।

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করে, শুনছেন কিছু ?

ঃ স্পষ্ট কিছু শুনিনি। ভাসা ভাসা ভাবে কানে আসছে।

ভুবন বলে, আমরা সাবধান আছি। তবে জানেন তো আমাগো কপাল !

অঘোর বলে, আপনেরা যদি সহায় থাকেন, দুষ্ট লোকের সাধ্য কি কিছু করে ?

রাজু বলে, আপনাগোই ভরসা করি। সরকার কন বড়লোক কন, কেউ আমাগো পক্ষে নাই।

সাধনা বলে, আপনারা শক্ত থাকবেন, নইলে আমরাই বা কি করব ? এখানকার লোকদের সঙ্গে কোন কারণে যেন ঝগড়া না হয় খেয়াল রাখবেন। কেউ কেউ ভাবে, আপনারা এসে দুর্দ্দশা বাড়িয়েছেন। না বুঝে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। ক্ষতি এরা করবে না বিশেষ, তবে মুখে একটু খোঁচা-টোচা দিলে সয়ে যাবেন, এড়িয়ে চলবেন।

ঃ হ, ঠিক কথা।

হে রাখাল, একবার তোমার সেই সাধনার রকম সকম ছ্যাখো, এতগুলি লোককে সে কেমন উপদেশ দিচ্ছে শোন। কোথায় ছিলে কোথায় আছো একবার খেয়াল হোক !

সুমতী, বীরেন আর বিনয়ের সঙ্গে রাখাল এসে সাধনাকে এই অবস্থায় দেখতে পায় কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলকে নিয়ে সে ক রকম জমিয়ে বসেছে এটুকুই তার নজরে পড়ে, তার কথাগুলি শুনতে সে পায় না।

রাখাল বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়।

ঃ তুমি আবার এখানে কি করছ?

ঃ এঁদের সঙ্গে কথা কইছি।

চটাং করে জবাবটা দেওয়া হয়। রাখালের বিরক্ত হবার জবাবে। এবং সকলেই সেটা টের পায়।

রাখাল অনির্দ্দিষ্টভাবে সকলকে উদ্দেশ করে বলে এখানকার সকলকে একটু ডেকে আনুন, একটা দরকারী কথ াছে।

কয়েকজন যারা বাকী ছিল তারা এলে রখাল প্রভাত সরকারের বক্তব্যটা তাদের কাছে পেশ করে এবং তারই জের টেনে আপশোষের সুরে শেষ করে, আপনারা নাকি প্রভাত বাবুর মাথা ফাটিয়ে দেবেন বলেছেন? দেখুন, আমরা আপনাদের হয়ে প্রভাতবাবুকে বলে দিলাম তিনি যেন কোন হাঙ্গামা না করেন, কিন্তু আপনারা যদি—

তার কথা শেষ হবার আগেই সাধনা মুখ খোলে।

ঃ প্রভাতবাবু এঁদের মেরে তাড়াবেন বলেছিলেন, এঁরাও তাই তার মাথা ফাটাবার কথা বলেছিলেন! এঁরা যেচে তাঁকে শাসাতে যান নি।

বিনয় সেন বলে, থাকগে রাখালবাবু, ওকথা আর তুলবেন না।

রাখাল কথাটার জের টানে না। বিস্ময় আর অস্বস্তি মেশানো দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

সুমতী বলে, আমরা একটা মিটিং ডাকব। প্রভাতবাবু সকলের সামনে তাঁর প্ল্যানের কথা বলবেন, লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন যে কারখানা আর ব্যারাক তৈরী হলে আপনাদের ফিরিয়ে আনবেন, কাজ দেবেন। আপনারা কি বলেন ?

সহজে কেউ মুখ খুলতে চায় না। খানিক আগেই সাধনা তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। প্রভাত হঠাৎ এরকম ভাল মানুষ হয়ে যাবে এবিষয়ে এমনিতেই তাদের যথেষ্ট সংশয় জাগত, সাধনা সাবধান করে দেওয়ার ফলে সেটা আরও জোরালো হয়েছে।

ভুবন সাধনাকেই জিজ্ঞাসা করে, আপনে কি কন ?

শুধু তার একার প্রশ্ন হলে কথা ছিল না, সাধনা কি বলে শুনবার জন্য এমন আগ্রহের সঙ্গেই সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে রাখালেরা সত্যই থ' বনে যায়।

এদের উপর এত প্রভাব সাধনার !

আর সাধনা নিজেকে বোধ করে অত্যন্ত অসহায়।

ঃ আমি কি বলব বলুন ? আপনারা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন।

সে যে তাদের মঙ্গল করতে চাওয়ায় ফিকিরে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় না এটা সকলে বুঝতে পারে,

বুঝতে পারে কর্তালি করার সুযোগ দিলেও সেটা সে ঝপ্ করে নিয়ে নেয় না বলে।

তাদের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্তালি করার জন্য কত রকমের কত লোক যে চেষ্টা করছে দিনরাত! দরদী সেজে মাভৈ মাভৈ বুলি আওড়াচ্ছে!

কাজেই তার মতামত শোনার আগ্রহ সকলের আরও বেড়ে যায়।

বিষ্ণু বলে, আপনে কি মনে করেন কন, তারপর আমরা পরামর্শ করুম।

সাধনা বলে, আমার মনে খটকা আছে। প্রভাতবাবুর কি মতলব জানি না, তবে গোলমাল তিনি নিশ্চয় করবেন। এদের একবার তুলে দিতে পারলে আবার ফিরে আসতে দেবেন মনে হয় না।

ঘরের কোণে তর্ক বিতর্ক নয়, ভেবে. চিন্তে রাখাল যা করবে স্থির করেছে এখানে প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সাধনা করছে তার বিরোধিতা!

বীরেন বলে, না না, ওরকম মতলব থাকলে প্ল্যানের কথা ঘোষণা করতেন না, লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হতেন না! তা হলে অন্য ব্যবস্থা করতেন।

বিনয় আমতা আমতা করে বলে, আমারও তাই মনে হয়। আইনের প্যাঁচে একটু ঠেকেছেন কিন্তু সেজন্য আটকাবে না, শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ এনে উনি আপনাদের তুলে দিতে পারবেন।

বিষ্ণু বলে, না, তা পারবেন না। উকিলের পরামর্শ নিচ্ছি।

সাধনা বলে, পুলিশ দিয়ে তাড়াতে পারলে কি প্রভাতবাবু এত প্ল্যান ভাঁজতেন?

রাখাল বলে, তোমার এসব কথা বলার দরকার কি?

সাধনা বলে, আমার যা মনে হয় বললাম।

সুমতী বলে, আমরা খবর নিয়েছি, কারখানা উনি সত্যই করবেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের বিষয়ে কথা ঠিক রাখবেন কি না বলতে পারি না, তবে এখানে কারখানা হবে এটা মিথ্যা নয়।

রাখাল বলে, তা হলে আর কথা কি? ঝগড়া করে আপনারা টিঁকতে পারবেন না। প্রভাতবাবুর প্ল্যান আপনারা যদি না মানেন, লোকে আপনাদেরি দোষী ভাববে। তখন প্রভাতবাবু যাই করুন, আপনাদের পক্ষ হয়ে কেউ কিছু বলবে না।

বিষ্ণু ভুবনেরা সাধনার দিকে তাকায়। সাধনা আবার অসহায় বোধ করে।

ভেবে চিন্তে সে বলে, ওটা হিসেব করেই অবশ্য প্রভাতবাবু প্ল্যানটা করেছেন। আপনাদের ভাল করতে চান অথচ আপনারা সেটা মানছেন না শুনলে কিছু লোক বিগড়ে যাবে সত্যি। তাই বলে সবাই যে আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে তার কোন মানে নেই। প্রভাতবাবুকেও তো জানে সবাই?

রাখাল :আবার বিস্ময় ও অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

সাধনা ভেবেছিল, বাড়ী ফিরে একচোট বেধে যাবে রাখালের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাখাল এ প্রসঙ্গই তোলে না। বোধ হয় সাধনাকে চটাতে সাহস পায় না! বিরক্ত ও গম্ভীর ভাবটা তার বজায় থাকে।

দু'দিন পরে মিটিংটা বসবার আগে সাধনাকে কাপড় বদলাতে দেখে রাখাল প্রশ্ন করে, মিটিংএ যাবে নাকি?

ঃ যাব।

ঃ বক্তৃতা করবে তো?

ঃ আমায় আবার কবে বক্তৃতা করতে দেখলে?

ঃ আগে দেখি নি, এবার হয় তো দেখব। কোন কথা পছন্দ না হলে উঠে বলতে আরম্ভ করবে।

ঃ দরকার মনে করলে যদি বলিই, তাতে দোষ আছে কিছু? তুমি কি চাও না আমি বাইরে যাই, কুনো ভাবটা কাটিয়ে উঠি? অন্য মেয়ে যারা সভায় বক্তৃতা দিতে পারে তাদের তো খুব শ্রদ্ধা কর তুমি! আমার বেলা বুঝি উল্টো নিয়ম?

রাখাল কাবু হয়ে বলে, তুমিও সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও না, আমি কি বারণ করছি? আমি বলছিলাম, পাড়ার দশজনের সামনে আমায় যেন অপদস্ত কোরো না!

সাধনা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমার কথা শুনলে সত্যি রাগ হয় মানুষের। আমি অবশ্য খালি দেখতে যাচ্ছি কি হয়, কিন্তু তোমার মতে সায় না দিতে পারলে তুমি অপদস্ত হবে কেন?

ঃ হব না? এক সভায় এক ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বলছে—

ঃ স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে বলছে না? স্ত্রী তাতে অপদস্ত হয় না?

ঃ আহা, এ মিটিংএ তোমার তো বলার কথা নয়। আমিই কথাটা তুলব।

ঃ তাতে কি এল গেল? তুমি বলবে না আমি বলব সেটাই কি বড় কথা? অতগুলি লোকের ভাল মন্দের কথাটা আসল নয়?

রাখাল আর তর্ক করে না।

কিন্তু মিটিংএ কলোনির মেয়েদের কাছে তাকে বসতে দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সুমতী আর সাধনা ছাড়া পাড়ার মেয়েরা কেউ এ সভায় আসে নি, আসবার কথাও নয় তাদের। সুমতী তাদের কাছে বসতে পারল, কলোনির মেয়েদের গা ঘেঁষে ছাড়া সাধনা বসবার যায়গা খুঁজে পেল না।

ছোট সভা। পাড়ার কিছু লোক, কলোনির লোক, আর নাগদের কলোনির সমিতির কয়েকজন সদস্য হাজির আছে। রাখাল প্রথমে সভার আলোচ্য বিষয়টি উপস্থিত

করে। ছোটখাট যেমন হোক, প্রকাশ্য সভাতে দাঁড়িয়ে রাখাল জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা দেয়।

নিরপেক্ষ ভাবে সব কথা বলে ভালই গুছিয়ে মোটামুটি সে। কিন্তু সাধনার মনে হয়, নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা যেন সে করছে বাড়াবাড়ি রকম। প্রভাতের পক্ষেই যেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার অতিরিক্ত নিরপেক্ষতা।

প্রভাত আর তার পরিকল্পনাকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়ে বামাচরণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে।

শুনে বড়ই রাগ হয় সাধনার।

কে কি ভাববে না ভাববে সে সব কথা তার মনেও আসে না, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা প্রভাতবাবুর গুণকীর্তন শুনতে আসি নি। প্রভাতবাবু যে নিজের কথা রাখবেন, পরে গোলমাল করবেন না, তার গ্যারাণ্টি কি সভায় আছে স্পষ্ট করে বলা হোক। সেটাই আসল কথা।

সভা থম থম করে। রাখালের মুখ লাল হয়ে যায়। আমরা! শুধু কলোনির লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলে নি সাধনা, তাদের সঙ্গে যেন এক হয়ে গিয়ে তাদেরি একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলেই প্রভাত খুসী কিন্তু সাধনার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত সেটা সম্ভব হয় না।

প্রভাত বলে, এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে আমি কথা দিচ্ছি, তাই কি যথেষ্ট গ্যারাণ্টি নয়?

সাধনা বলে, না। মুখের কথা তুদিন বাদে অদল বদল করা যায়। আপনি নিজেই হয় তো ভুলে যাবেন কি বলেছিলেন, বলবেন, আমি এরকম বলি নি, ওরকম বলেছিলাম। লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আপত্তি হচ্ছে কেন?

বামাচরণ লাফিয়ে উঠে বলে, কিছু না, কিছু না! আপত্তি কিসের?

পরদিন সকালে দেখা যায় তাদের বাড়ীর সদর দরজায় এবং পাড়ার অনেকগুলি দেয়ালে সাধনার নামে ছড়া কেটে পোষ্টার আঁটা হয়েছে রাতারাতি!

বাড়ীর কাছে কলোনিতে সুন্দর ছোঁড়া থাকে,
সাধনাদিদি পোষ মেনেছেন, পিরীতের দড়ি নাকে।
রাখাল দাদার আক্কেল গুরুম—

বাকীটা অশ্লীল!

বাসন্তী বলে, সত্যি আক্কেল গুড়ুম করেছিস ভাই! কী ধিঙ্গি হচ্ছিস দিন দিন? পাড়া তোলপাড় হচ্ছে তোর কথা নিয়ে!

ঃ কেন? সুমতী তো হরদম সভা করে বেড়াচ্ছে। আমি একদিন একটা সভায় একটু বলেছি, সবার তাতে টনক নড়ল কেন?

ঃ তুই কি সুমতী? ওর বিয়ে হয় নি, কলেজে পড়ে, অনেককাল মিটিং করছে, ওরটা সয়ে গেছে সবার। সবাই জানে, ও ওই রকম। তুই ছিলি ঘরের বৌ, হঠাৎ একদিন

সভায় দাঁড়িয়ে কোমর বেঁধে স্বামীর সঙ্গে লড়াই করলি—চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়বে না ?

ঃ স্বামীর সাথে লড়াই ? আমি তো ঝগড়া করলাম প্রভাতবাবুদের সাথে ?

ঃ লোকে বুঝি জানে না রাখালবাবু ওদের দলে ? তাই তো বলছে সবাই যে কাণ্ড ছাখো। ছ'পক্ষের ঝগড়া, স্বামী নিয়েছে এপক্ষ বৌ গিয়েছে অন্ত পক্ষে। রাখালবাবু চটেন নি ?

ঃ কথা বন্ধ করেছে।

ঃ করবেন না ? তেমন সোয়ামী হলে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে দিত।

ঃ ইস! সে দিন আর নেই!

ঃ নেই ? তুই হাসালি ভাই। এ পাড়াতেই ছ'চার জন মাঝে মাঝে পিটোয়!

একথা সে কথার পর বাসন্তী হঠাৎ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কলোনির সুন্দর ছোঁড়াটা কে ভাই ?

সাধনাও হেসে বলে, কে জানে! ওরাও জানে না, তা হলে নামটা বসিয়ে দিত।

ঃ কী বজ্জাত, এ্যা ? ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিবি না ?

ঃ কেন ছিঁড়ব ? দশজনের পড়তে ভাল লাগলে পড়ুক!

ছড়া পড়ে লোকে যে হাসাহাসি করে না এমন নয়, কিন্তু বেলা ন'টা নাগাদ দেখা যায় পাড়ার লোকেই একে একে

পোস্টারগুলি সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সাধনাদের দরজায় লাগানো পোষ্টারটাই বরং ছেঁড়া হয় সবার শেষে!

কয়েকদিনের মধ্যে কুঁড়েগুলি সরে গিয়ে কলোনির জমিটা শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে।

সাধনার মনে হয়, শূন্যতা লেপে যেন মুছে দেওয়া হয়েছে একটা ছবিকে।

কিছুদিন পরে ফাঁকা জমিটাতে জোড়জোড়ের সঙ্গে কারখানা তৈরীর কাজ আরম্ভ হলে সে স্বস্তি বোধ করে।

প্রভাত সত্যই কারখানা গড়ছে বলে শুধু নয়। যায়গাটার শূন্যতা ঘুচে গেছে বলেও!

রাখাল কথা বন্ধ করুক, তার নামে ছড়া কেটে পোষ্টার লাগানো হোক, পাড়ার মেয়েরা তাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাক, একটা প্রায় বৈঠকের মত ছোটখাট সভায় উদ্বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে তেজের সঙ্গে একটু তর্ক করায় সাধনার কপাল একদিকে গেছে খুলে।

সভাসমিতির পক্ষে তার মূল্য টের পেয়ে গিয়েছে আশেপাশের সভাসমিতির উদ্যোক্তারা।

কয়েকদিন বাদেই প্রকাশ্য সভায় যোগদানের জন্য তাকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। শ্রোতা হিসাবে নয়, কিছু বলার জন্য।

সুমতীর সঙ্গে আসে মধ্য-যৌবনা একটি মহিলা। সাদাসিদে চেহারা, সাদাসিদে বেশ, চোখ দুটির শান্তভাবের জন্য দৃষ্টি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে না।

গলার আওয়াজ ও কথা মার্জিত ও সুস্পষ্ট বলে মিষ্টতাটাও হঠাৎ খেয়াল হয় না।

সুমতী পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি প্রমীলা বসু, আপনার সাথে আলাপ করতে এসেছেন।

নামটা ভালভাবেই শোনা ছিল। সাধনা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে! জীবনে সে কখনো নামকরা মানুষের সংস্রবে আসে নি, পুরুষ বা নারী।

নার্ভাস হয়ে সে শুধু ব'লে, আসুন, বসুন।

সাধারণ আলাপ পরিচয় হতে হতেই সে অবশ্য ধাত ফিরে পায়। এরকম নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে বিনা নোটিশে একেবারে ঘরের মধ্যে পাওয়া অভ্যাস ছিল না বলেই প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল।

খানিক আলাপ করে প্রমীলা বলে, সামনের রোববার আমরা একটা মিটিং ডাকছি—হাইস্কুলের হলটাতে হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য কি ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন তো? এমনিতেই এদেশে শিশুমৃত্যুর হার কিরকম, একটু দুধটুধ না পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের কি অবস্থা এসব তো আপনার জানাই আছে। তার উপরে আরও কতগুলি বাড়তি কারণ ঘটে একেবারে শেষ করে দিচ্ছে ওদের। যেমন ধরুন, বাঙালী ছেলেমেয়ের রুটি সয় না।

কিন্তু চাল কমিয়ে দিয়েছে, বাধ্য হয়ে খেতে হয়। চীন থেকে বিনা সর্তে চাল দিতে চায়, সে চাল নেবে না। দুধ যেটুকু জোটে তাতেও ভেজাল—

প্রায় জানা কথাই সব বলে প্রমীলা। অবস্থা যে কি ভয়ানক বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই কারো জানতে আর বাকী নেই। কিন্তু বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের দিক থেকে সমস্যাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে সামনে ধরে বলে প্রমীলার কথা শুনতে শুনতে সাধনার মনে হয় সব জানা থাক্‌লেও সে অবস্থাটা একেবারেই ধরতে পারে নি।

প্রমীলা বলে, সাধারণভাবে শিশুকল্যাণ আন্দোলন তো চলছেই। এই মিটিংএ আমরা বিশেষভাবে জোর দেব—সহজে অবিলম্বে যেসব বিষয়ে প্রতিকার করা যায়। যেমন ওই চালের কথাটা। খাদ্য-সমস্যা নিয়ে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো নিয়ে সাধারণ আন্দোলন চলছে—আমরা ওদিকে যাব না। আমরা শুধু দাবী করব, ছোটদের কার্ডে চালের পরিমাণ বড়দের সমান করা হোক। এই ধরণের সব আলোচনা। আপনাকে যেতে হবে।

সাধনা জানে তাকে শুধু মিটিংএ যেতেই বলা হচ্ছে, সে তাই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব। শুধু মেয়েদের মিটিং?

: না, পাবলিক মিটিং। তবে মেয়েরা যাতে বেশী সংখ্যায় যান সে চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে।

: মিটিং-এ ? কি যে বলেন ! আমি কি বক্তৃতা দিতে জানি ?

: বক্তৃতা কেন দেবেন ? শুধু বক্তৃতায় আসর জমিয়ে ঘরে ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর দিন কি আছে ? আপনি সোজা ভাষায় আপনার মনের কথা বলবেন।

: তাও কোনদিন বলি নি !

: তাতে কি ? আপনি তো বোবা নন্, কথা বলতে জানেন !

প্রমীলা হাসে।—এই সেদিন একটা সভাতে সদ্য সদ্য গাঁ থেকে এসে গেরস্ত চাষী ঘরের বৌ—দশ বার মিনিট একটানা বলে গেল। কি চোখা চোখা ধারাল সব কথা ! নাম করা বড় বড় বক্তার চেয়ে বেশী কাজ হল বৌটির কথায়। প্রাণে যখন জ্বালা ধরে যায় সোজা স্পষ্ট কথা বলতে কি আর ট্রেনিং দরকার হয় ?

সাধনা আজকাল চালাক হয়েছে। সে একটু ভেবে বলে, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

: রাখালবাবু ? ওঁকেও যেতে হবে—কিছু বলতে হবে। আমরা ওঁকেও বলেছি।

সাধনা খুশী হয়। রাখাল নিশ্চয় আজ ভাল ভাবে তার সঙ্গে কথা কইবে। তাকে আর তুচ্ছ করতে পারবে না। কলোনির ব্যাপার নিয়ে যেচে কথা কইতে গিয়ে সে রাখালের বিরোধিতা করে বসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তো রাখালের সঙ্গে তার কোন মতের অমিল নেই। ছোট ছেলেমেয়েরা

ভাত না পেয়ে ভেজাল খেয়ে বিনা চিকিসায় অব্যবস্থায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেও চায় রাখালও চায় এর প্রতিকার।

তা ছাড়া সে যেচে সভায় যাবে না। তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সভায় গিয়ে কিছু বলার জন্য—শুধু সুমতীকে পাঠিয়ে দায় সারা হিসাবে নয়, স্বয়ং প্রমীলা বসু বাড়ী বয়ে এসে তাকে অনুরোধ করে গেছে!

স্ত্রীর এ সম্মানে কি খুসী না হয়ে পারবে রাখাল?

রাখাল কথা বন্ধ করেছে।

তার মানে এই নয় যে বাড়ীতে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকে! সে বাজার করবে সাধনা রাঁধবে, সে ওষুধ এনে দিলে সাধনা সময় মত ছেলেকে খাওয়াবে, ডাক্তার তাকে নির্দ্দেশগুলি জানিয়ে দিলেও সাধনাই সেগুলি পালন করবে, দু'ঘণ্টা অন্তর থার্মোমিটার দিয়ে ছেলের টেম্পারেচারের চার্ট রাখবে, এক বিছানায় না হলেও এক ঘরে শুয়ে রাত কাটাবে, জ্বরো ছেলেটার কান্নায় বহুবার দু'জনের ঘুম ভেঙ্গে যাবে,—একেবারে বোবা হয়ে থেকে কি আর এসব চালানো যায়!

কথা বন্ধ করেছে মানে একান্ত দরকারী সংসারী কথা ছাড়া একটা কথাও সে বলে না।

মিষ্টি কথা দূর থাক, কড়া কথাও নয়!

সব চেয়ে সাংঘাতিক কথা, সাধনাকে সে পনের দিন ছোঁয় নি!

এটা সংযম নয়। সংঘাতের সাংঘাতিক অঘটন।

ভয়ানক কলহ আগেও হয়েছে। চিরতরে যেন সম্পর্ক ঘুচে যাবে এমন কুৎসিৎ নিষ্ঠুর কলহ। তখন কেঁদে মুখ ফোলায়নি সাধনা, ঘৃণা আর বিদ্বেষেই মুখ তার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে, গম্ভীর নিস্পৃহ ভাবে নীরবে সে রাতে রুটি বেড়ে খেতে দিয়েছে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত রাখালকে। রাখালও তীব্র বিতৃষ্ণায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠে খাটে বসে একটা সিগারেট টেনে মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে এবং হয় তো বা ঘুমিয়েও পড়েছে।

এ রকম কলহের পর সাধনা কিছু খেত না, জোরালো খিদে পেলেও খেত না। কারণ দুর্ভিক্ষ এসে গেলেও সে তো আর সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েনি—রাত্রে অনশন ধর্ম্মঘট করবে ভেবেই কি বিকালে রাখাল ফিরবার অনেক আগেই রুটি সেঁকতে সেঁকতে সে তিন চারখানা রুটি বিনা উপাদানে খেয়ে নিত?

না খেয়ে হেঁসেল গুছিয়ে সে ঘরে গিয়ে মেঝেটা আরেক-বার ঝাঁট দিয়ে শুয়ে পড়ত। এবং বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ত।

মাঝরাত্রে রাখাল এসে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলত, মেঝেতে শুয়েছ যে? ঠাণ্ডা লাগবে না? অসুখ করবে না? বিছানায় এসে শোও।

রাখাল তাকে ডেকেছে বিছানায় গিয়ে শুতে এবং সেও বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। এবং তারপর

কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে যে রাখাল নামক ᐟ ˉষ এবং সাধনা নামক নারীটির মধ্যে সেইদিন কোন কার৷. ˉনামালিন্য হয়েছিল!

দু'জনে . ন চিরদিনই একদেহ একপ্রাণ!

সকালে অবশ্য তারা স্বীকার করে নি রাত্রে দু'জনের কোন বিবাদ ছিল না। গম্ভীর মুখেই রাখাল বাজার এনে দিয়েছে এবং ঘৃণায় বিদ্বেষে বিকৃত মুখ নিয়েই সাধনা রান্না করেছে।

তবু তখন তাদের ঘৃণা রাগ বিতৃষ্ণা যেমন সত্য ছিল তেমনি সত্য ছিল ওসব নিয়েও সারাদিন ঘরসংসার চালিয়ে যাওয়া এবং রাত্রে সব সমস্যা পরদিনের জন্য ধামাচাপা দিয়ে রেখে অভ্যস্ত মিলনে একাত্ম হওয়া।

এবার প্রায় পনের দিন দিনের বেলা তারা বিবাদ এবং পরস্পরকে ঘৃণা করার পাটটা বজায় রেখে এসেছে বেশ খানিকটা নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা ও উদারতার ঠাট দিয়ে, কিন্তু রাত্রে তারা জেগেছে ঘুমিয়েছে পরস্পরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে!

খোকার জ্বর বলেই সাধনা যেন সেই অজুহাতে নতুন একটিও শয্যা সৃষ্টি করেছে যুদ্ধের এমার্জেন্সিকে প্রাধান্য দিয়ে। মেঝেতে মশারি সমেত সে শয্যায় রাখালের যেন প্রবেশ নিষেধ।

রাখালও যেন তাদের বহু বছরের পুরানো বাসর শয্যার খাটে শুয়ে সাধনার প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করে গাঢ় ঘুমের দুর্ভেদ্য বাঁধ রচনা করেছে প্রতি রাত্রে।

শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। জ্বরে কাতর ছেলেটা কেঁদে ঘর ফাটিয়ে দিলেও তার ঘুম ভাঙ্গে না!

আগে ছেলের কান্নায় যে বার বার জেগে যেত, সাধনার সামান্য কাসির শব্দে যার ঘুম ভেঙ্গে যেত, সে আজ চোদ্দ পনেরটা রাত যেন বোমা ঠেকানো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে।

এ সংযম সে পেল কোথায়?

শুধু তাই নয়।

তার সম্পর্কে অদ্ভুত বৈরাগ্য আর গাঢ় ঘুম ছাড়াও আরেকটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়াটা বাদ যাচ্ছে রাখালের!

আজ পর্য্যন্ত এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি। বাইরে নেমন্তন্ন থাকলেই কেবল রাত্রে বাড়ীতে খাওয়াটা বাদ যেত রাখালের, তার জন্য রান্নাই হত না। আগে থেকে কিছু জানা নেই, হঠাৎ কোন যোগাযোগ ঘটে রাত্রির ভোজনটা জুটে গেল—এটা ঘটত কদাচিৎ।

এবারকার মনান্তরের পনের ষোলটা দিনের মধ্যে এটা ঘটেছে সাতবার। গোণা গাঁথা হিসাব আছে সাধনার।

রান্না হয়েছে তার জন্য। অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে সে জানিয়েছে যে খাবে না।

আজও ফিরে এসে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে বলে, আমি খেয়ে এসেছি।

ঘুমে আর শ্রান্তিতে তার ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে সাধনার

মনটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে, মমতার যেন বন্যা বয়ে যায় তার হৃদয়ে।

প্রমীলার কথা শুনে আজ সে মিটমাটের আশা পোষণ করছিল কিনা, বোধ হয় সেইজন্য!

সব ভুলে যায় সাধনা। হাসিমুখে বলে, জানো রোববারের সভায় আমাকেও যেতে বলেছে। প্রমীলা বসু নিজে—

বলতে বলতে একেবারে গা গেঁসে দাঁড়ায় রাখালের। রাখাল মুখ ফিরিয়ে নেয়। খানিকটা তফাতে সরে যায়।

পক্ষাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে যায় সাধনার। যে ভাবে দোল খায় পায়ের নীচের পৃথিবী, কি করে বে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ভেবে পায় না।

তবু জোর করে সাধনা নিজের মনকে বলে, সে নিশ্চয় ভুল করেছে! রাখালের মুখে সে গন্ধ নয়। নিজে সে ঠিক বুঝতে পারে নি।

কিম্বা রাখাল হয় তো কোন ওষুধ খেয়েছে—ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত। কথা বন্ধ, অসুখ হলেও রাখাল তো তাকে জানাবে না। ওষুধটার জন্যই গাঢ় ঘুমও হচ্ছে রাখালের।

যন্ত্রের মত রান্না ঘরে গিয়ে রুটি নিয়ে দু'খানা কোন রকমে খায়, হেঁসেল তুলে রান্নাঘর বন্ধ করে উঠানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতই জ্যোস্নায় ভাসানো আকাশের দিকেও চোখ তুলে তাকায়।

তারপর ঘরে যায়।

রাখালের তখন নাক ডাকছে।

রুগ্ন ছেলেটা ক্ষীণস্বরে কাঁদছিল। তাকে উপেক্ষা করে সাধনা খাটের দিকে এগিয়ে যায়।

তখনও সে ভাবছে, সন্দেহ মিটিয়ে নেব? না, সংশয়টুকু আঁকড়ে থাকব?

কিন্তু তা তো আর হয় না। স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে নিজে ভুল করেছি মনে করে কতক্ষণ আর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

যেন আত্মহত্যা করছে এমানভাবে সে ঝুঁকে পড়ে রাখালের মুখের উপর!

এতখানি প্রত্যক্ষ নির্ভুল পরীক্ষার অবশ্য কোনই দরকার ছিল না। মশারি তুলতেই রাখালের নিশ্বাসের গন্ধ বেশ ভাল ভাবেই তার নাকে গিয়েছিল।

গা গুলিয়ে বমি আসে। বাইরে ছুটে গিয়ে সাধনা যা কিছু খেয়েছিল সব বমি করে ফেলে।

অনভ্যস্ত পদার্থটা একটু বেশী পান করে ফেলায় রাখালেরও আজ বমি আসছিল। তার নিশ্বাসে পদার্থটার গন্ধ শুঁকেই সাধনা বমি করে ফেলে।

আশা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কি হয়েছে ভাই? বমি করছ কেন?

সঞ্জীবও উঠে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। ওর নেশা ভাল ভাল জিনিষ খেয়ে দামী দামী জামা পরে

সিনেমা থিয়েটার দেখে সুখে থাখার জন্য ঋণ করে গোল্লায় যাওয়া।

আর সংঘাতের যাঁতা কল থেকে ত্রাণ পাবার আশায় রাখাল ধরেছে নতুন নেশা।

বমি করেছে। কাজেই দু'এক মিনিট কথা না বলাটা বেখাপ্পা হবে না। তাকে দম নিতে হবে তো।

সেই অবসরে সাধনা একটু ভেবে নেয়।

আশার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটের ডগায় ঠেলে এসেছিল : তোমার মত আমারও বরাত খুলেছে ভাই !

কিন্তু জবাবটা সে ঠেকিয়ে রাখে। এই মাত্র টের পেল রাখাল মদ খেয়েছে। যা ছিল অসম্ভব তাই সম্ভব হয়েছে। যা ছিল কল্পনাতীত তাই বাস্তব হয়েছে। আরও হয় তো কত কিছু জানবার বুঝবার ভাববার থাকতে পারে এ বিষয়ে।

হয়তো রোজ খায় না, আজ কোন বিশেষ কারণে রাখাল মদ খেয়েছে।

মদ মেশানো ওষুধও তো থাকে। খোকা হবার পর সেও টনিক খেয়েছিল মদ মেশানো।

এরকম একটা ধাক্কা খেয়ে তার তো এই অবস্থা। এখন তার এমন কিছু বলা উচিত কি আশাকে, পরে দরকার হলেও যা ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না ?

অসম্ভব যখন সম্ভবই হয়েছে, তার কি উচিত নয় আগে ভেবে দেখা কি করে এটা হয় ?

রাখালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছে তার মতের বিরোধিতা করেছে, প্রভাতকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে, আরেক সভায় কিছু বলার নিমন্ত্রণ জানাতে প্রমীলার মত মানুষ বাড়ী বয়ে এসেছে, রাখাল মদ খেয়েছে বলেই তার কি আত্মহারা হওয়া উচিত ?

মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল তো রাখাল হয় নি।

মুখের গন্ধ ছাড়া তো টেরও পাওয়া যায় নি সে মদ খেয়েছ !

আশা ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে না এলে আজ রাত্রেই সাধনা কত কি পাগলামি করত কে জানে। আশাকে সব বলে ফেলার ঝোঁকটা সামলাতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা খুঁজে পায়।

ভিতরে তার যাই হোক, বাইরে নিজেকে সংযত রাখে অনায়াসে।

আশাও অবশ্য শুধু প্রশ্ন করেই দাঁড়িয়ে থাকে নি, ছুটে গিয়ে এক ঘটি জলও এনেছিল।

আশা আবার জিজ্ঞাসা করে, কি হল ভাই ?

মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে সাধনা শান্তভাবে বলে, কি জানি, গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল।

: রাখালবাবু ফেরেন নি ?

: খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

: খুব শক্ত ঘুম তো রাখালবাবুর !

কানের কাছে মুখ এনে আশা চুপিসারে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার ? আবার নাকি ?

সাধনা বলে, যাঃ ! অত বার বার খায় না !

গলা একটু উঁচু করে সঞ্জীবকেও শুনিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলে, কৃমির জন্য বোধ হয়।

সঞ্জীব এগিয়ে এসে বলে, কৃমিই হবে। বেশী রুটি খেলে ভীষণ কৃমি হয়। শ্যামবাবু বলেছিলেন, রুটি খেতে আরম্ভ করার পর বাড়ীশুদ্ধ সকলে মাসে দু'বার করে কৃমির ওষুধ খাচ্ছেন।

সাধনা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সঞ্জীববাবু, এ্যালকোহল খেলে নাকি কৃমি মরে যায় ?

সঞ্জীব বলে, কি জানি, বলতে পারছি না। কৃমির জন্য ভিন্ন ওষুধ আছে জানি।

: রুটি খেয়ে খেয়ে আমারি বমি হল। ছোট ছেলেমেয়েরা কি করে রুটি খেয়ে সহ্য করে মাগো !

রাত্রি প্রভাত হবেই। যেমন রাত্রিই হোক।

সকালে প্রথামত সাধনা রাখালকে চা আর খাবার দেয়—মুখ হাত ধুয়ে রাখালও প্রথামত রান্নাঘরে একটা আস্ত ইঁটকে পিঁড়ি করে প্রাতরাশ খেতে বসে।

প্রথায় একটু তারতম্য করেছে সাধনা। রাখাল ঘুম ভেঙ্গে উঠবার আগে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে এগার পয়সার একছটাক নিরামিষ গাছগাছড়াগত ঘি মুদি দোকান থেকে আনিয়ে বাসি রুটির বদলে দু'খানা পরোটা ভেজে দিয়েছে রাখালকে।

রাত্রে রাখাল খায় নি। তার ডিমটাও গরম করে দিয়েছে—ঝোলটা নিজেই চেখে পরীক্ষা করে দেখেছে টক্ হয়ে গিয়েছে কি না।

রাখাল ডিম আলু ঝোল সব কিছু দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলে, ডিমে আবার আলু দাও কেন? আলুর সের কত হয়েছে জান?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখাল দোকানে চলে যাবার পর নিজের ধৈর্য্যশক্তির জন্য সে গর্ব্ব বোধ করে।

শেষ বোঝাপড়া করে ফেলার অদম্য সাধকে সে আজ অসীম সংযম দিয়ে দমন করেছে!

মন সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। রাখালের সঙ্গে আর নয়। এবার চুকে বুকে যাওয়াই ভাল!

কোথায় যাবে কি করবে তাও সে ঠিক রাত্রেই। কলোনির লোকেরা যেখানে সরে গিয়ে নতুন কুঁড়ে তুলেছে সেখানে ওদের সাহায্যে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাস করবে। মান অভিমান বিসর্জ্জন দেবে। পেট চালাবার জন্য একমাত্র দেহ বিক্রীর উপায়টা ছাড়া যে কোন উপায় মাথা পেতে নেবে।

সকালে সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। বোঝা-পড়াটা শুধু কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে।

রাখাল যে কি করে মদ ধরতে পারে এই অবিশ্বাস্য দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারটা সে কয়েকদিন একটু বুঝবার চেষ্টা করবে।

হয় তো এটা নিছক দু'দিনের একটা পরীক্ষা রাখালের, —খাপছাড়া হলেও হয় তো রাখাল খেয়ালের বসেই নেশা করার অভিজ্ঞতাটা যাচাই করে দেখছে। হয় তো ব্যবসার জন্য—লাখ টাকা করার নতুন স্বপ্নটা সফল করার জন্য—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারো সঙ্গে মদটা দু'চারদিন বাধ্য হয়ে গিলতে হচ্ছে রাখালের।

কিম্বা হয় তো তার জন্যই মদ খাচ্ছে রাখাল! তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও এক বাড়ীতে পরের মত বাস করার চাপটা হয় তো অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের পক্ষে, তাকে বাতিল করে এক ঘরে রাতের পর রাত কাটানো অসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় উন্মাদের মত হয় তো সে এই উপায় অবলম্বন করেছে। মদ খেয়ে এসে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমানো যায়, সাধনার অদম্য আকর্ষণ ঠেকানো যায়, তার কাছে নত হতে হয় না!

এটাই যদি কারণ হয় রাখালের মদ খাওয়ার, তাহলে অবশ্য শেষ বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিতেই হবে সাধনাকে।

পুরুষ মানুষ দু'একদিন মদ খেলে তার জাত যায় না। সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে বাইরেই হোক বা বাড়ীতে তার সামনেই হোক—রাখাল দু'একদিন মদ খেলে তুচ্ছ করার মত উদারতা সাধনার আছে।

কিন্তু তার জন্যই যদি রাখাল মদ ধরে থাকে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য রকম। দু'একদিন নয়, নিয়মিত-

ভাবে নেশারই বিকৃত তৃষ্ণায় রাখাল যদি মত খেতে সুরু করে থাকে—তবু তাকে ক্ষমা না করে উপায় থাকবে না সাধনার।

শোধরাতে পারবে কি পারবে না সে ভিন্ন কথা। তারই জন্য মাতাল হয়ে থাকলে মাতাল স্বামীর ঘর সাধনাকে করতেই হবে!

অবশ্য, তারই জন্য রাখাল এই মারাত্মক কাণ্ড সুরু করেছে কিনা সাধনা তা জানে না। রাখালের মদ খাওয়ার কোন সঠিক মানেই ঢুকছে না তার মগজে। কয়েকদিন ধৈর্য্য ধরে রাখালের এই নতুন ব্যাধির মানেটা বুঝবার চেষ্টা তো অন্ততঃ করতে হবে সাধনাকে।

মশা রক্ত শোষণ করে রক্তে রেখে যায় ম্যালেরিয়া—শোষক সমাজকে শুষে রেখে দেয় বেকারত্ব ইত্যাদির অভিশাপ। এই তো সেদিন সাধনা রাখালের বেকারত্বকে ব্যাধি বলে ভুল করেছে, অনেক অন্যায় করেছে। পরে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে অনেক ধিক্কার দিয়েছে সেজন্য।

রাখালের বেকারত্বের ব্যাধিটাও ছিল তার কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। রাখাল বেকার হয়েছে এটা যেন ছিল রাখালেরই অপরাধ, এত লোকে চাকরী বাকরী করছে তবু রাখাল কোন যুক্তিতে বেকার হয়—এই ছিল তার বিচার!

পাড়ার অনেকেই মদ খায় না রাখাল কেন মদ খাবে—

এরকম সিধে বিচার করে শেষ সিদ্ধান্ত করা আজ অসম্ভব হয়ে গেছে সাধনার পক্ষে।

বাসন্তীকেও ক'দিন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

সাধনা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, মেয়েমানুষের যন্ত্রণার কি অন্ত আছে? মানুষটার রকমসকম সুবিধে লাগছে না কদিন ধরে—কিন্তু কিছু বলছে মুখ ফুটে না। নিজে থেকেই বলবে ভেবে চুপ করে আছি, কিন্তু এবার শুধোতে হবে।

ঃ রকমসকম সুবিধে লাগছে না মানে?

ঃ মানে একটু বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে। বাইরে মুস্কিলে পড়লে ব্যাটাছেলের যেমন হয়। দোকানে কিছু গোলমাল হয়েছে জানো? তোমার কত্তা কিছু বলেছে?

সাধনার মনে একটা প্রশ্ন ঝিলিক মেরে যায়—তাই কি তবে কারণ রাখালের মদ খাওয়ার? বাইরে কোন মুস্কিলে পড়েছে—কারবারে কাজেকর্মে গণ্ডগোল ঘটেছে? তার জন্য নয়!

ঃ কিছু তো বলে নি আমায়। রাজীববাবুর কি বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে?

ঃ মন মেজাজ ভাল থাকছে না।

ভাসা ভাসা জবাব দিয়ে বাসন্তী যেন কথাটা চাপা দিয়ে দেয়।

নেশা করে রাখাল মরার মত ঘুমায়। রাজীবের ধাত অন্যরকম, তার জাগে ফূর্তির ঝোঁক। তার ফূর্তির ঠেলা

সামলাতে হয় বাসন্তীকে—হাসিমুখে। নেশার খেয়াল সব স্বীকার করে নিতে হয়। নইলে যে কোন লাভ নেই বাসন্তী তা জানে। রাগারাগি করলে, নেশার ঝোঁক ব্যাহত হলে, মদ গিলে রাজীব আর বাড়ী আসবে না—একজনের ঘরে গিয়ে উঠবে যেখানে পয়সা দিয়ে অবাধে ফূর্তি করা যায়!

ওসব বদ খেয়াল রাজীবের কোনদিন নেই। কিন্তু নেশা করলে কতগুলি পাগলামি তার আসবেই। ঘরে তাকে নিয়ে পাগলামি করতে পেলেই, তার চলে।

সে সুযোগ না দিয়ে তাকে নেশা করে বাজারের মেয়েলোকের ঘরে যেতে বাধ্য করার মত বোকা বাসন্তী নয়।

কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে তো একটা বোঝাপড়া চাই। চুপ করে থাকলে চলবে কেন?

বাসন্তী বলে, তোমার মুখে রোজ গন্ধ পাচ্ছি। এত বাড়াচ্ছ কেন? রোজ তুমি মাতাল হয়ে এসে দাপট চালাবে—আমার শরীরটা কি লোহা দিয়ে গড়া?

সকালে বেলা বাড়লে রাজীবকে খেতে দিয়ে বলে।

রাজীবের কৃত্রিম উন্মত্ততার কোন সমালোচনাই বাসন্তী করে না। রাজীব নেশার ঘোরে যা বলেছে যা চেয়েছে তাই সই!

মাথা হেঁট করে খায় রাজীব। বিবেক তার এখন অনুতাপে গলে যেতে চাইছে। রাত্রে কি ভাবে নির্য্যাতন করেছে বাসন্তীকে কিছুই সে ভুলে যায় নি। রাত্রে সব সয়ে গেছে বাসন্তী। সকালে তাকে চা খাবার দিয়েছে। কে জানে

কাকে দিয়ে কিভাবে মাছ আনিয়ে ঝোল রেঁধে ভাত বেড়ে দিয়েছে দোকানে যাবার আগে।

আপিসী বাবুর বৌ নয়। বিড়িপাতার দোকানদারের বৌ। তবু যেন আপিসী বাবুদের বৌদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে তাকে বাবুর মত আরাম রাখতে চায়। আঁধার থাকতে উঠে উনানে আঁচ দেয়!

চালতার টক অদ্ভুত রকম ভালবাসে রাজীব—টক-মেয়েদের চেয়েও।

চালতার টক পর্য্যন্ত বাসন্তী রেঁধেছে তার জন্য!

রাজীব বলে, না, টক খাব না।

বাসন্তী বলে, বকলাম বলে?

: না, দাঁত ব্যথা করছে। মাড়ির সেই দাঁতটা।

: আজ তবে না গেলে দোকানে? পুষ্পের মাকে দিয়ে একটা পাঁট আনিয়ে রেখো। রাতে ব্যথা বাড়লে খেয়ো।

রাজীব হেসে বলে, সে জন্য নয় গো—দাঁতের ব্যথার জন্য নয়। তোমার কাছে লুকোচ্ছি নাকি আমি কিছু? ভদ্দর

কর ছেলের সঙ্গে ভিড়ে মোর দশা রফা হতে বসেছে। ঝোঁকের মাথায় কদিন মাল গিলছে রাখালবাবু—

: ওমা! এই ব্যাপার? রাখালবাবুর সঙ্গে খাচ্ছ!

: আর বল কেন। কোনদিন খেত না, হঠাৎ জোরসে চালিয়েছে। একদিন কামাই নেই।

: একটু সামলাতে পার না?

ঃ হাঃ, ওকে সামলাবে! বিদ্যেগুলী বৌ নিয়ে হয়েছে বেচারার মুস্কিল! মাল টানতে টানতে বলে কি জানো? বলে বৌ তো নয়, যেন মাষ্টার! যেন থানার মেয়ে দারোগা! কত লেখাপড়া শিখেছে, কি জ্ঞানবুদ্ধি—তবু কোনদিক সামলাতে পারছে না। মানুষটা ভেঙ্গে যাচ্ছে দিন দিন।

ঃ লেখাপড়া জানা বাবুদের বড্ড বেশী মান অভিমান। একটু ছুঁলেই যেন ফোস্কা পড়ে। একটু বুঝিয়ে বলতে পারো না?

ঃ কী করে বুঝাই বলো? এত জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা, সব জানে বোঝে। মুখ্যু মানুষের কথা শুনবে কেন?

বাসন্তী তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মুখ্যু মানুষ? আমার বাবা মুখ্যু মানুষই ভাল! বই-এর জ্ঞান না থাক, কাণ্ডজ্ঞান তো আছে!

রাজীব দাঁতের ব্যথা নিয়েই দোকানে যায়। বাসন্তীও জানে যে দাঁতের ব্যথা তেমন মারাত্মক না হলে দোকানে না যাওয়ার বিলাসিতার মানে হয় না—তাদের পোষায় না ওসব। দোকানে না গিয়ে বাড়ী বসে থাকলে কি দাঁতের ব্যথা রেহাই দেবে, কমে যাবে!

দাঁত যা ব্যথা দেবার দেবেই। ঘরেও দেবে দোকানেও দেবে। দোকানে গেলে বরং রোজগার হবে দু'টো পয়সা!

রাখাল দোকানে যাবে বটে। রাজীব না গেলে যে দোকান একেবারে খোলা হবে না এমন নয়। কিন্তু রাখালের উপর অন্য হিসাবে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা এখনো বজায় থাকলেও তার দোকান চালানোর ক্ষমতায় রাজীব বিশ্বাস হারিয়েছে।

সে শুধু যেন নীতি খাটায়। নীতি খাটিয়ে দোকান ভাল চললে খুসীই হত রাজীব। কিন্তু বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান চালানোর নীতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না রাখালের বইয়ে পড়া উচিত অনুচিতের জটিল অঙ্ক কষে বার করা নীতির!

বামাচরণকে সত্যই কি আর ভক্তি করত রাজীব। লোকটাকে সে বজ্জাত বলেই জানত। কিন্তু তার মুস্কিল হল এই যে লোকটা কবিতা লিখতে পারত—কবিতার একটা বই লিখে ফেলা শুধু নয়, সেটা ছাপিয়ে একখানা উপহার দিয়েছিল রাজীবকে।

অগত্যা তাকে ভক্তি করতে হয়েছিল! কবি—ছাপার অক্ষরে ছাপানো বই-এর কবি! সে কেমন মানুষ জানবার অধিকার তো নেই বিড়িপাতা শুখার দোকানদার অল্প শিক্ষিত রাজীবের। সাধু সন্ন্যাসী যোগীর মত কবিও হল আলাদা জগতের মানুষ, উঁচু জগতের মানুষ—লাখপতি কোটিপতি রাজা জমিদারদের বড়লোকামি উঁচু জাতটার কাছে ঘেঁষা ভিন্ন আরেকটা জগতের মানুষ।

কবিতা লিখে এবং ছাপানো কবিতার পাঁচসিকে দামের

একখানি বই তাকে উপহার দিয়ে বামাচরণ বোধ হয় কয়েক বছরে তিন চার শ' টাকার সিগারেট ধারে খেয়েছে তার দোকান থেকে।

"বাকী চাহিয়া লজ্জা দিবেন না" কথাগুলি সোণালী অক্ষরে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখার কোন অর্থই রাজীব বুঝতে পারে নি দশ বছরে। বাকী যারা নেবার তারা নেবেই। তাদের ঠেকানো যায় না।

চোরা কারবার চলছে দেশে। একটু সরকারী সুবিধা পেলেই একজন ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি উল্টে দিয়ে মোটা লাভ বাগাচ্ছে। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছে না লাভ টানবে কোথা দিয়ে কী ভাবে।

তখন যদি নতুনভাবে লাভ করার কায়দা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ং একজন কবি ছাপানো কবিতার বই দিয়ে তাকে শিক্ষিত মার্জিত কাব্যরসিকের মতন খাতির করে, সে কি ভড়কে না গিয়ে পারে?

কে জানে। হয় তো তার বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান করাই ভুল। কালোবাজারী বড় ব্যাপারীদের দাপট সইতে হয়েছে বলেই হয় তো সে তেজী কালোবাজারী বাঘের তুলনায় স্রেফ ছুঁচো বনে গেছে!

এই গভীর আত্মগ্লানি বোধ করার সময় এসেছিল কবি বামাচরণ। কবি কি কখনো ছুঁচোকে কবিতার বই উপহার দেয়—এত বড় বড় মানুষ থাকতে?

কবির খাতির হতাশার গ্লানি দূর করে সত্যই জোর এনে

দিয়েছিল রাজীবের মনে। নিজেকে ছোট মনে করার আপশোষ কেটে গিয়েছিল।

কে বলে সে বাজে মানুষ?

বামাচরণ ধারে সিগারেট নিতে আরম্ভ করলে সে গোড়ায় বোধ করেছিল আনন্দ।

গুরুদেবকে কিছু দান করার সুযোগ পেলে তার বাবার যেমন আনন্দ হত!

ক্রমে ক্রমে জানা গিয়েছিল বামাচরণের ধারে জিনিষ নেবার কৌশলটা। মাঝে মাঝে নগদ দিয়েও সিগারেট কিনত, মাঝে মাঝে পুরাণো ধার দু' পাঁচ টাকা শোধও দিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যেত বাকীর পরিমাণটা তার বেড়েই চলেছে!

কবির কাছে সম্মান লাভের ও আধ্যাত্মিক কথাবার্ত্তা শোনার জন্য কয়েক বছর ধরে এই খেসারত দিয়ে আসতে হয়েছিল রাজীবকে।

রাখালের সঙ্গে নতুন দোকান খোলার পর সে বাদ না সাধলে কবিকে যোগী ভাবার দাম সে আরও কতকাল দিয়ে চলত কে জানে। তবে বামাচরণ আর নতুন কবিতার বইটই বার না করায় এবং মোট বাকীর পরিমাণটা অত্যধিক হয়ে দাঁড়ানোয়, ভক্তিতে একটু ভাঁটা পড়তে আরম্ভ করেছিল রাজীবের।

সন্ন্যাসী নতুন নতুন ক্ষমতার পরিচয় না দিলে পুরাণো ম্যাজিকে মুগ্ধ ভক্তের মোহ যেমন ক্রমে ক্রমে কেটে যেতে থাকে।

বামাচরণকে সোজাসুজি ধারে সিগারেট দিতে অস্বীকার করায় রাজীব রাখালকেই প্রায় ভক্তি করে বসেছিল।

দীর্ঘদিনের একটা আধ্যাত্মিক বাঁধনের ফাঁস থেকে এমন অনায়াসে যে তাকে মুক্তি দিতে পারে সে তো সহজ সাধারণ মানুষ নয়!

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ভক্তি ও আস্থা নষ্ট হয়েছে রাজীবের।

রাখালের বাস্তব-বুদ্ধি কেমন যেন খাপছাড়া। কখনও লোহার মত শক্ত আর কখনও মাখনের মত নরম হয়ে সে তার বাস্তব বুদ্ধি খাটায়। দু'একবার ঠিকমত লেগে যায় না এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো রকম হয়। যখন শক্ত হওয়া দরকার—যেমন বামাচরণের বেলা সে হয়েছিল—তখন সে হয় নরম আর যখন নরম হওয়া উচিত, যেমন সরকারের লোক নরেশবাবু দোকানে এলে একটু ভদ্রতা করা দরকার—তখন সে হয় শক্ত আর গরম।

লুকানো গাঁজার খোঁজে তাই না সেদিন দোকানে তার খানাতল্লাসী হয়ে গেল।

গাঁজা অবশ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু নরেশবাবুর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার না করলে পরেরবার গাঁজা যে তার দোকানে পাওয়া যাবে না তার স্থিরতা কি?

বিনা দোষে লোক ছাঁটাই হয় বলে, দেশে ভাত কাপড়ের অভাব বলে, চোরা কারবার আর দুর্নীতি চলে বলে সরকারের

উপর তার ভীষণ রাগ। নরেশ ঘুষ খায় বলে গায়ে তার ভীষণ জ্বালা। বেশ তো—এ সবের প্রতিকার যে ভাবে হয় করবে যাও। একটা দোকান দিয়ে আর দশটা দোকানের মত চালাবে না, গোয়ার্তুমি করে দফা শেষ করবে দোকানের, তা হলে দোকান করার দরকারটা কি ছিল?

মুদিখানা হোক বিড়ির দোকান হোক কিছু লোকের সঙ্গে বাকীতে কারবার করতেই হবে। চাকরে বাবু মাসের শেষ ভাগে ধার নিয়ে মাস কাবারে শোধ দেয়। এক দোকানে না দিলে অন্য দোকান তাকে বাকী দেবে। পুরাণো চেনা খদ্দেরের হাতে কোন সময়ে টাকা নেই—কয়েকদিনের জন্য বাকীতে মাল চাইলে তাকেও দিতেই হবে।

বাকী দিলে সবটা আদায় হবে না, কিছু টাকা মারা যাবে, এটা হিসাবে ধরে নিয়েই বাকীতে কারবার করতে হয়। এটা সাধারণ চলতি নিয়ম।

নইলে খদ্দের মারা যাবে। অন্য দোকানী বাগিয়ে নেবে।

কিন্তু রাখাল এ নিয়ম বুঝতে চায় না, মানতে চায় না! কি হওয়া উচিত আর কি হওয়া উচিত নয় শুধু এই হিসাব কষে সে বাস্তব নিয়ম-নীতি উল্টে দিতে চায়!

রাখালের জন্য কয়েকজন ভাল ভাল খদ্দের তারা হারিয়েছে।

এদিকে কারবার বাড়াবার জন্য তার মনগড়া অবাস্তব পরিকল্পনা এবং অবাস্তব ঝোঁকটাও ক্রমাগত সামলে চলতে হচ্ছে রাজীবকে।

শুধু চাইলেই যে কারবার হু হু করে বাড়ানো যায় না, সেটাও বাস্তব নিয়মে নির্দ্দিষ্ট রেটে ঘটে, এই সহজ সাধারণ কথাটাও যেন বুঝতে চায় না রাখাল। রাজীবকে ভীরু কাপুরুষ জড়ধর্ম্মী মানুষ মনে করে।

সেটা টের পায় রাজীব। সাধারণ দোকানদার বলে অশ্রদ্ধা টের না পাবার মত ভোঁতা সে নয়!

রাখাল বলে, আপনি অতিরিক্ত সাবধান। একটু রিস্ক না নিলে উন্নতি করা যায়?

রাজীব বলে, বাজারটা দেখছেন না রাখাল বাবু? এ বাজারে টিঁকে থাকা দায়, রিস্ক নেবেন কোন ভরসায়?

একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে যে!

: এই সেদিন তো রিস্ক নিয়েছিলেন, আগের পার্টনারের সঙ্গে। সে একবার ডুবিয়ে দিয়েছে বলে বুঝি আর সাহস পাচ্ছেন না?

: আপনি বুঝছেন না রাখাল বাবু। রিস্ক আমি নিতে যাই নি। সে ব্যাটা কতগুলি ভাঁওতা দিয়েছিল, আমি সেটা ধরতে পারি নি। কেন পারি নি জানেন? আমার ঘাড় ভাঙ্গবার মতলবে ভাঁওতা দিয়েছিল, কিন্তু মিছে কথা বলে নি। যা বলেছিল সব ও ব্যাটা করতে পারত—আমরা দুজনেই আজ কোথায় উঠে যেতাম। আমাকে ঠকিয়ে সস্তায় কিছু মেরে দেবার কোন দরকার ছিল না। কত আর মারলি তুই? প্ল্যানটা খাটালে যে দুজনেই ফেঁপে যেতাম দু'তিন

বছরে—হাজারগুণ বেশী জুটত তোর! কিন্তু মানুষের দুর্মতি হলে সে কি বাঁকা পথ ছাড়া চলে?

রাখাল সাগ্রহে বলে, ওরকম একটা প্ল্যান করুন না?

রাজীব মনে মনে বলে, এই রোগেই তো ঘোড়া মরে! রাতারাতি বড়লোক হতে না চাইলে বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষটা তুমি এমন বোকার মত কথা বল!

মুখে বলে, কি নিয়ে প্ল্যান করব বলুন? ওর সুযোগ সুবিধা ছিল—ক্ষমতাওলা লোকের সাথে পর্য্যন্ত যোগাযোগ ঘটেছিল। সম্ভব অসম্ভব অবস্থা বিবেচনা করে তবে তো প্ল্যান করা চলে? আমাদের না আছে টাকার সম্বল, না আছে অন্য সম্বল। কি দিয়ে প্ল্যান করবেন?

রাখালের মুখে হতাশা ঘনাতে দেখে রাজীবও দমে যায়।

রাখালের সাহায্যেই নতুন দোকানটা খোলা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যেই রাখালকে সে ভয় করতে সুরু করেছে!

ধাতটা হল ভদ্দরলোকের, চাকুরে মানুষের। খেয়ালের বশে দোকানটাকে সেই আবার ডুবিয়ে না দেয়!

•

বাসন্তী বলে, এ আবার কি ধিঙ্গিপনা লো? এ সব কি শুনছি? খুব নাকি কর্তালি সুরু করে কর্তাকে নেশায় ডুবোচ্ছ?

: কার কাছে শুনলি?

: আমি আবার কার কাছে শুনব, গেরস্ত ঘরের বৌ? যার কাছে শোনার কথা তার কাছেই শুনেছি।

: কি বললেন তিনি ?

: বললেন আপনার গুণপনার কথা—আপনার কর্ত্তাটির কাছে যেমন শুনেছেন তাই বললেন।

সাধনা অধীর হয়ে বলে, কি বলেছে বলনা শুনি ভাই ?

বাসন্তী চোখ পাকিয়ে তাকায়, কড়া সুরে বলে, আমার কাছে ন্যাকামি করিস নে ভাই। আমি তো জানি তুই কেমন ব্যবহার জুড়েছিস মানুষটার সঙ্গে ? এই দিনকাল, বাইরে হাজার রকম ঠেলা সামলাতে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, ঘরে তুই একটু শান্তি দিস না মানুষটাকে। তোর জন্য আমার ওই মানুষটাকে পর্য্যন্ত বেশী মাল টানতে হচ্ছে।

: মাল মানে মদ, না ? উনিও খান ?

বাসন্তী ছাতের দিকে মুখ উঁচু করে বলে, ভগবান !

মুখ নামিয়ে বলে, সত্যি ন্যাকামি করছিস, না, সত্যি সত্যি কথা কইছিস বুঝতে পারছি না ভাই। নইলে আজ তোতে আমাতে শেষ ঝগড়া হয়ে সম্পর্ক চুকে যেত।

বাসন্তী উদাসভাবে বলে, চুকিয়ে দিলেই হয় সম্পর্ক।

তার এই ভাবান্তর বাসন্তীকে সতর্ক করে দেয়। মনপ্রাণ দিয়ে সখি হয়ে সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল যে তারা দু'জনে একস্তরের জীব নয়। একেবারে উপর তলার মানুষের পদাঘাতে প্রায় তাদের স্তরে নেমে এলেও সাধনা এখন পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে নিছক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার বেশী আত্মীয়তা করতে চায় নি।

তাহলেই তো বাসন্তীর মুস্কিল। আপন ভেবে যার মঙ্গল

করতে সে ছুটে এসেছে, কয়েকটা সহজ বাস্তব কথা যাকে বোনের মত বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, সে যদি না আপন ভাবে তাকে, তার প্রাণ খোলা সহজ সরল কথা না শুনতে চায়, যুক্তি দিয়ে তর্ক বিতর্কের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে মনের কথা বুঝিয়ে বলার শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ভব্যতা তো তার নেই।

ওভাবে মনের কথা খুলে বলার চেষ্টা ত্যাগ করে সে অগত্যা ঘটনাটা খবরের কাগজে রিপোর্ট দেওয়ার মত সোজাসুজি বাসন্তীকে জানাবার চেষ্টা করে, বলে, সন্ধ্যা হতে না হতে তোমার কর্ত্তা ওনাকে মাল খেতে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। উনি তো দশটার আগে দোকান ছেড়ে বেরোবেন না, মিছিমিছি রোজ মালও উনি খান না— তোমার কর্ত্তাটি তাই দোকানে মাল আনিয়ে খান। গোড়ার দিকে গুম্ খেয়ে চুপচাপ একলাটি খান। তারপর ওনাকে দু'এক পাত্র চুমুক দিতে এগিয়ে দেন। এমনি উনি খেতেন না, কিন্তু এভাবে একজন এগিয়ে দিলে মানুষ না খেয়ে পারে? তোমার কর্ত্তার মান রাখতে ওনাকেও গিলতে হয়।

সাধনা বলে, সে তো বুঝলাম। আসল কথা বল।

: আসল কথা মানে তোমার কথা তো? রোজ নাকি তোমার কথা ওঠে। কিছুক্ষণ চুপচাপ মাল টেনে নেশা হলে রাখালবাবু তোমার কথা পাড়েন। কতরকম যে গুণকীর্ত্তন করেন

তার নাকি ঠিক ঠিকানা নেই। সে সব যাক, আসল কথা বলেন, তুমি নাকি আর বৌ নেই, ওসব পাট তুলে দিয়েছ। তোমার কর্ত্তার মুখে শুনে আমার কর্ত্তাটি যা বলেছে আমি কিন্তু তোমাকে তাই বলছি ভাই!

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বলে যাও।

: ওই তো বললাম? তোমার কর্ত্তা নালিশ করেন, তুমি নাকি বৌ নেই, একদম স্বাধীন কলেজে পড়া কুমারী মেয়ে হয়ে গেছ—ছেলেটার দিকেও নাকি তুমি তাকিয়ে দেখ না। তুমি নাকি ইস্তিরি-ধর্ম পালন কর না, এক মাসের ওপর কাছে ঘেঁষতে দেও নি বেচারাকে।

সাধনা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচালি ভাই!

: কি রকম?

: আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার জন্যেই কি মদ ধরেছে? বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তুই আমাকে বুঝিয়ে দিলি, আমারি দোষে বেচারা ছাইপাঁশ খেয়ে গোল্লায় যাচ্ছে!

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে পলকহীন বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন সে যেন একেবারেই চিনতে পারে নি সাধনাকে।

: সত্যি অবাক করলি ভাই। তোর বিদ্যাবুদ্ধিকেও বলিহারি যাই। কী দিয়ে মানুষটাকে এতদিন বশে রাখলি তাই আমি ভাবি। তোর গুণে নয়, মানুষটা নিজের গুণে তোর বশ হয়ে ছিল। তোর সত্যিকার চেহারা ধরা পড়েছে, তাই আজ বেচারা মদ খায়।

: তার মানে ?

: তোর সঙ্গে অমিল হয়েছে বলে মাল খাচ্ছে ভাবছিস ? পুরুষ মানুষের গরজ পড়েছে বৌয়ের খাতিরে মদ খাবার ! তোর জন্যেই যদি মদ খাবার মত অবস্থা হয়ে থাকে—অনেক আগে তোকে লাথি মেরে দূর করে দিয়ে মনের মত আরেকটা বৌ সে আনতে পারত না ? বৌ যেন এতই দামী যে ব্যাটাছেলে আরও তু'চারটে বৌ পোষার মত টাকা খরচ করবে, শরীর নষ্ট করবে, একটা বৌয়ের জন্য ! কেন নিজেকে বাড়াস ভাই, নিজেকে ভাঁড়াস ? সোজা কথা বাঁকা করে নিয়ে কেন মিছে অশান্তি সৃষ্টি করিস ?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, সোজা কথাটা কি ?

: সোজা কথাটা হল, রাখালবাবুর মত লোক যখন হঠাৎ মদ ধরেছে, এমনিতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে মানুষটার, ধাক্কা সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে। ঘরে কোথায় একটু শান্তি দিবি, ঠিক উল্টোটা করছিস—শত্রুতা জুড়েছিস !

: কিছু হয়ে থাকলে বলবে না আমায় ?

: তেমন ব্যবহার করলে হয় তো বল তো। ভালবাসা থাকলেই পুরুষ মানুষ সব সময় সব কথা কি বৌকে বলে ? বৌকে ভয় ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও অনেক সময় অনেক কথা চেপে যায়। জানার সাধ থাকলে অবিশ্যি পেটের কথা বার করতে কতক্ষণ ?

সাধনা তিক্ত সুরে বলে, সে তুমি পার। তোমাদের সে সম্পর্ক বজায় আছে। আমরা বিগড়ে গিয়েছি একেবারে।

: তোমরা বিগড়ে যাও নি। তোমাদের সব ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে কি না, সেটাই হয়েছে মুস্কিল। রাখাল বাবু আপিস করছেন বিড়ির দোকানে, ঘর সংসার ফেলে বৌ মানুষ তুমি বাইরে করছ ধিঙ্গিপনা—এসব কি আর মিছিমিছি ঘটেছে? দিনকালটাই গেছে বিগড়ে, তোমরা খাপ খাচ্ছ না। তোমরাও বিগড়ে গেলে তো ভাবনাই ছিল না, দিব্যি খাপ খেয়ে যেতে!

অবস্থা বদলে গেছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না।

এই কথা তাকে শুনিয়ে গেল বাসন্তী।

তার এই অনেকদিনের জানা কথাটা!

এমনভাবে শুনিয়ে গেল যেন আসল অপরাধটা অবস্থার, সব কিছুর জন্য দায়ী পরিবর্ত্তনটা, তাদের খাপ খাওয়ার অক্ষমতা নয়।

কথাটা সত্য এবং সহজ। বাসন্তী পর্য্যন্ত এটা ধরতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত হিসাবে তাদের জীবনে ভাঙ্গনটা অবশ্যম্ভাবী, নীচের স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাকার তাদের হতেই হবে, কিন্তু সেটা এমন কদর্য্য কুৎসিৎ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই ঘটতে হবে এমন তো কোন কথা নেই!

ভাঙ্গনের বাস্তবতা সুখকর হয় না, হতে পারে না, তা জানে সাধনা। মধ্যবিত্তের অনেক মিথ্যা স্বপ্ন ও কল্পনা,

বিশ্বাস ও ধারণা; অবাস্তব আরাম বিলাস ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া রীতিমত বেদনাদায়ক হবেই।

যদিও ভাঙ্গার সঙ্গে গড়াও চলে, নতুন সম্পর্কের মধ্যে জীবন আরও ছড়ানো ও জমাট হয়, নতুন আশা জীবনের আনন্দ ও সার্থকতার নতুন রূপ চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু এতো তা নয়। এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাঁকি, অকারণ কুৎসিৎ বিড়ম্বনা। দেশ জুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে বৈকি।

এই বিকৃত অমানুষিক অবস্থাটা তাদের ভদ্র জীবনে রূপান্তর ঘটাবার জন্য অপরিহার্য্য ছিল না এবং তাদের ভেঙে নতুন মানুষ করার প্রয়োজনেও এ অবস্থা সৃষ্টি হয় নি।

ভাঙ্গন নয়। এই অবস্থাটাই অসহ্য হয়েছে তাদের। রাখাল শুধু বেকার হয় নি বিনা দোষে, শুধু অর্থাভাবই ঘটে নি তাদের—রাখাল আজ শুধু অনভ্যস্ত উপায়ে জীবিকাই অর্জ্জন করছে না—তখন যেমন আজও তেমনি ফাঁকি আর ধাপ্পাবাজি দিয়ে টিঁকিয়ে রাখা বিকারের বিরাট বেড়াজালে তাদের আটক রাখা হয়েছে।

রাখালদের বেকার হয়ে না খেয়ে মরার দশা হয় কিন্তু বেকারত্বের প্রতিকারের বদলে বিরাট তোড়জোড়ের সঙ্গে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা অবাস্তবতা সম্পর্কে মিথ্যা মোহ। রাখালের মত ভদ্রলোকদের জীবনের বাস্তবতা যেমনই দাঁড়াক, ভদ্র থাকাই অসম্ভব হয়ে যাক,

ভদ্র জীবনের নিছক সাজানো গোছানো খোলসগুলি, কৃত্রিমতাগুলি, অবাস্তব ভাবাবেগগুলি জীবনের সেরা সম্পদ হিসাবে মহাসমারোহে বাঁচিয়ে রাখা হয়।

তলিয়ে সব না বুঝুক, বাসন্তী জীবনের সহজ নিয়ম মানে। সে তাই টের পেয়েছে জীবনে কত অনিয়ম আমদানী হওয়ায় তাদের আজ কী দশা। নীচের তলার সাধারণ গরীব মানুষের সব রকম দুর্দ্দশাই আছে, একেবারে না খেয়ে মরা পর্য্যন্ত চরম দুর্দ্দশা,—কিন্তু মৃত জীবনের ভূতের বোঝা তাদের সইতে হয় না।

তারা যতই পিছিয়ে থাক, সংস্কার ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাক, তারা নিজের জগতেই আছে, রুক্ষ কঠোর বাস্তবতা নিয়েই আছে।

সেখান থেকে শিশুর মত হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোলেও প্রতিদিন এগোচ্ছে।

রাখাল সাধনাদের মত জরী চুমকি বসানো লাল নীল বাতি দিয়ে সাজানো হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করা কৃত্রিম অবাস্তব মিনার ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর ঝনঝাট তাদের নেই।

ভদ্রঘরের ছেলে বাধ্য হয়ে কারখানায় খাটছে, কণ্ডাক্টরি করছে, ফেরিওলা হয়েছে—কিন্তু সেটা যেন জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য নয়, ভদ্রজীবনটাকে কোন রকমে বাঁচাবার জন্য।

এ দায় নেই বাসন্তীদের। ছলনা চাতুরী নিয়ে নয়, হিসাব করা পলিসি নিয়ে নয়, রাজীবের জর

হলে সাল্‌সা খাওয়ানোর মত প্রয়োজনীয় মনে করেই অন্যভাবে তার শরীর মন অসুস্থ দেখলে বাসন্তী অনায়াসে তাকে বলতে পারে: শরীর খারাপ লাগছে? একটা পাঁট এনে খেয়ে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড় না!

সোজা কথাটা সে বোঝে। দরকার হলে পাঁট রাখাল খাবেই। মৃত্যু পণ করে চেষ্টা করলে একদিন কি দু'দিন হয় তো সে ঠেকাতে পারবে রাজীবকে—তারপর দিন তার মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে রাজীব বাইরে পাঁট খেয়ে আসবে!

অসুখের মতই এরকম একটা অবস্থা আসে শরীর মনের। পাঁট না খেয়েও অবশ্য সে অবস্থার প্রতিকার করা যায়। কিন্তু যে অবস্থায় তারা আছে তাতে সেটা সম্ভরপর কোন প্রতিকার নয়—অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা।

সোভিয়েটে নাকি এভাবে এই কারণে কারো মদ খাবার দরকার হয় না। এসব উদ্ভট রোগের নাকি মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে সে দেশে।

ভাগ্যবান দেশ। ধন্য দেশ।

কিন্তু বাস্তব জীবন পিষে দমিয়ে দিয়েছে রাজীবকে। এটা কোন বীজাণু-ঘটিত রোগ নয়, সমগ্র জীবনের মাস বছর-ঘটিত বাস্তবতার সৃষ্টি করা রোগ।

পাঁট না খেলে রাজীব তিন-ভাগ রাত ছটফট করবে। মদ না খেয়েও মাতালের চেয়ে বেশী আবোল তাবোল বকবে—শ্যামা সঙ্গীত উল্টে পাল্টে গাইবে, কপাল চাপড়াবে—শরীর মনের যন্ত্রণায় যেন মদ মাতালের চেয়েও কষ্ট পাবে।

পরদিন হয়ে থাকবে নির্জীব প্রাণহীন মানুষ।

তার চেয়ে কি আসে যায় এসময় একটু খেলে? শরীর মনের কষ্টটা ভুলে বেলা পর্য্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে অনেকটা তাজা বোধ করলে?

মাসে দু'তিন দিনের বেশী তো আর দরকার হয় না।

যারা নেশার জন্য নিয়মিত খায় তাদের কথা আলাদা। তাদের সাংঘাতিক রোগ। সব দিক দিয়ে সর্ব্বনাশ ডেকে আনে।

ডেকে আনে কিন্তু সেও তো রোগী? নীতি কথায় কি রোগ সারে? বাস্তব লাগসই চিকিৎসা ছাড়া?

তাই বটে। নইলে কারখানায় প্রাণপাত করে যারা খাটে তাদেরও অনেকে রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে কয়েক আউন্স জল মেশানো আধ্যাত্মিক দাওয়াই খেতে যাবে কেন?

জীবনের বাস্তবতাই এ রোগের জন্য দায়ী।

কি করবে ভেবে পায় না সাধনা।

বেকার রাখাল তাকে ভাই-এর কাছে পাঠাতে চেয়েছিল। চরম দুরবস্থা বলে সে যেতে রাজী হয় নি। এবার কিছুদিন ঘুরে আসবে?

কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? তাকে নিয়ে যখন আসল সমস্যা নয় রাখালের, তার জন্য যখন মদ খাওয়া নয়, সে সরে গেলে কি আসবে যাবে রাখালের।

ঘরের অশান্তি থেকে রেহাই পাবে? আগে হলে এভাবে উভয় পক্ষের অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব মনে করত

সাধনা। সেদিন আর নেই। তফাতে সরে গেলে দু'জনে যে ধরণের শান্তি পাবে তার দাম খুবই সামন্য হয়ে গেছে তার কাছে।

সে জানে, সম্পর্ক বজায় রেখে দূরে সরে গেলে তুচ্ছ খুঁটি-নাটি সংঘাতগুলিই শুধু বাতিল হবে, রাগ দুঃখ অভিমান আর দুশ্চিন্তায় যা পুষিয়ে যাবে শতগুণ!

রবিবার রাখাল জানায়, সে সভায় যাবে না।

: আমি যাব বলে?

রাখাল চুপ করে থাকে।

: আমার বাইরে যাওয়া তুমি পছন্দ করছ না কেন?

: পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। এক মিটিং-এ দুজনের যাওয়া উচিত নয়।

: কেন?

: তোমার আমার মত মেলে না বলে। আবার একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আগেকার সভায় সংঘর্ষ ঘটবার পর আজ প্রথম তাদের মধ্যে সংক্ষেপে সংসারের দরকারী কথা ছাড়া বোঝাপড়ার কথা হয় কয়েকটা।

সাধনা থেমে না গিয়ে বলে, একটা বিষয় মত মেলে নি বলে কি সব বিষয়ে অমিল হবে?

: কোন বিষয়ে আমাদের মতের মিল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একরকম ভাবো, আমি আরেক রকম ভাবি।

: আগে মিল ছিল, নতুন কথা কি এমন ভাবতে আরম্ভ করেছি যে সব দিক দিয়ে অমিল হয়ে গেল ?

: ভাবছ বৈকি। আসল কথাটাই অন্যভাবে ভাবছ। স্ত্রীর যেটা সবচেয়ে বড় কর্তব্য হওয়া আমি উচিত মনে করি, তুমি তার উল্টোটা উচিত মনে করছ। আমার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছো—

: আমি করেছি ? তুমিই কথা বন্ধ করেছ, আমায় এড়িয়ে চলছ, মদ খাচ্ছ। তুমি যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে, যেমন চাইবে তেমনিভাবে চলতে হবে, এটাই যদি আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে কর—

রাখাল চুপ করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: তুমি বুঝবে আশা করি না। কতগুলি বাঁধা বুলি আর ছাঁকা নীতি শিখেছ, তুমি আর কিছু শুনতেও চাও না, বুঝতেও চাও না। আমার হুকুম মেনে চলবে কি চলবে না, সে প্রশ্নই আলাদা। আগে কি হুকুম মেনে চলতে ? আমি বলছি স্ত্রী হিসাবে তোমার যেটা করা উচিত, নিজে থেকেই করা উচিত। তোমার আমার স্বার্থ এক, এই সোজা কথাটা মানার সঙ্গে আমার হুকুমে চলার সম্পর্ক কি ? আমি বড় হলে, টাকা করলে, নাম কিনলে তুমিও সেসব ভোগ করবে, আমি পথের ভিখারী হলে তুমিও পথে বসবে, উপোস করবে। এটা তো অতি সহজ সরল কথা। আমি সুখী না হলে তোমার সুখী হবার সাধ্য আছে ? তুমি বলবে এটা ভারি অন্যায়, সমাজের

এটা বিশ্রী অনিয়ম, এরকম ব্যবস্থার জন্যই স্ত্রীকে স্বামীর দাসী হয়ে থাকতে হয়। বেশ কথা, আন্দোলন চালাও, অন্যায় অবিচারের প্রতিকার কর। কিন্তু স্ত্রী হয়ে থেকে স্বামীর স্বার্থ দেখবে না কোন্ যুক্তিতে ?

: তোমার কোন্ স্বার্থের হানি করেছি ? সেদিন সভায় বলেছিলাম বলে তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে ? বরং দেখতেই পাচ্ছ, দশজনের কাছে তোমার আমার দু'জনেরি মর্যাদা বেড়েছে।

: তোমার বেড়েছে—আমার নয়। লোকে বলছে রাখাল বাবুর স্ত্রী না থাকলে প্রভাত ওদের ঠকাত। অর্থাৎ রাখালবাবু ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাজে লোক, তাঁর দ্বারা কিছু হত না।

: তুমি উল্টো মানে করছ। আমায় ভাল বললে তোমায় বাজে লোক বলা হয় না। আসলে, তুমি ভুল করতে যাচ্ছিলে, আমি ঠিক করেছি, তাই তোমার রাগ। তোমায় না বলে লোকে আমায় কেন ভাল বলবে !

তীব্র বিরক্তি আর হতাশা ফোটে রাখালের মুখে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে, তোমায় কিছু বলা বৃথা। তুমি নিজের ভাবনাতেই মসগুল। তোমায় হিংসা করব আমি ? তুমি যাওনা দশটা সভায়, নাম কেনো মর্য্যাদা বাড়াও। আমি বারণ করছি ? আমি যার মধ্যে আছি সেখানে মাথা গলিয়ে আমার বিরোধিতা করবে কেন ? দেশে কি আর আন্দোলন নেই, সমিতি নেই, সভা হয় না ? দেশের লোককে কি অন্য

ভাবে কেউ ঠকাচ্ছে না ? তোমার মতামতের স্বাধীনতা আছে, সেটা প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে—কিন্তু যেখানে তোমার স্বামীর মর্য্যাদার প্রশ্ন সেখানে স্বামীর স্বার্থটাই তুমি দেখবে আগে। সেদিনের সভায় আমার জন্য তোমার মাথাব্যথা দেখা যায় নি, এটাই আসল কথা। আমার প্রভাব প্রতি-পত্তি বাড়ার বদলে কমে যাক, আমি ছোট হই দশজনের কাছে, সেজন্য তোমার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই।

রাখাল একটু থেমে যোগ দেয়, তুমি ভাবছ একদিনের একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি। সামান্য ব্যাপার নয়। সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমার সমস্ত স্বার্থই তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি নাম করব, টাকা করব শুধু এই স্বার্থ নয়—তাহলেও একটু ভরসা থাকত। আমার বদনাম হলে যে তোমারও লজ্জা, আমি পয়সা না কামালে যে তুমিও উপোস করবে, তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি আর স্বামী নই তোমার কাছে। একটা অভ্যাস টেনে চলছ, নিয়ম রক্ষা করছ, এই মাত্র।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

: তুমি আর স্বামী নেই মানে তোমার জন্য আমার ভাল-বাসা নেই ?

: ভালবাসা ? ভালবাসা আছে কি নেই সে আলাদা কথা, স্বামী স্ত্রী না হয়েও ভালবাসা নিয়ে মানুষ একসাথে থাকে। তাদের কথাও আলাদা। আমি বলছি, আমরা স্বামী স্ত্রী, একটা বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক আছে আমাদের। সমাজটা

খারাপ হোক, এ সমাজে স্বামী স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক না থাক—সম্পর্কটা তো আছে। এ সম্পর্কের মূল নিয়ম হল—স্বামী স্ত্রীর স্বার্থ এক হবে। ছোটখাট খুঁটিনাটি স্বার্থ নিয়ে ছু'জনে হাজার বিরোধ থাক—মূল স্বার্থে তফাৎ থাকবে না। হাতের বাড়তি টাকাটা দিয়ে স্ত্রীর একখানা গয়না হবে না স্বামীর একটা সখ মিটবে তা নিয়ে মারামারি হোক—স্বামীর রোজগার বাড়ুক এটা হবে ছু'জনেরি স্বার্থ।

সাধনা নত মুখে ভাবে।

মনের কথাটা বলবে রাখালকে? রাখাল আরও বেশী রাগ করতে পারে, আরও বেশী ত্যাগ করতে পারে তাকে, এ আশঙ্কা থাকলেও বলবে?

রাখাল হয় তো বুঝতেও পারে তার কথাটা। একেবারে তো মূর্খ নয় মানুষটা।

ভেবে চিন্তে বলাই ঠিক করে সাধনা। যে অবস্থায় তারা এসে পৌঁচেছে, খোলাখুলি কথা বলাই ভাল।

ঃ টাকার চেয়ে নামের চেয়ে স্বামী মানুষ হিসাবে বড় হোক এই স্বার্থটা যদি বড় হয় স্ত্রীর কাছে?

ঃ আমি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি? কদিন মদ খাচ্ছি বলে? তোমার জন্যই আমি মদ খাচ্ছি। এ অবস্থা মানুষের সহ্য হয় না।

বাসন্তীর কাছে সাধনা কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সহজ মোটা একটা কথা সেদিন সে বুঝিয়ে না দিলে আজ নিজের ভাব-প্রবণতার ফাঁকি নিয়ে সে ফাঁপড়ে পড়ে যেত।

ঃ তুমি তাই ভাবছ—কিন্তু স্ত্রীর জন্য কেউ মদ খায় না। তোমার কি হয়েছে আমি জানি না—কিন্তু মদ খাওয়ার জন্য আমায় দায়ী কোরো না।

রাখাল অপলক চোখে চেয়ে থাকে।

সাধনা বলে, তোমায় অমানুষ বলি নি। মানুষ হিসাবে বড় হও মানে বলছি না যে গান্ধীজির মত সাধু পুরুষ হতে হবে। টাকা পয়সা নাম যশের চেয়ে দশজনের স্বার্থ তোমার কাছে বড় হবে—আমি শুধু এইটুকু চাই।

ঃ টাকা করব না? দেশের লোক খেতে পরতে পায় না, তাই বলে টাকা করে নিজে সুখে থাকার চেষ্টা করা আমার পক্ষে অপরাধ?

ঃ নিশ্চয় না। মানুষের ঘাড় না ভাঙ্গলেই হল। তুমি আমি দশজনের মত সাধারণ মানুষ—তোমায় অসাধারণ মানুষ হতে বলব কেন? সব ছেড়ে দিয়ে তুমি শুধু দেশোদ্ধার করতে নামলে ভাল হত, এমন কথা আমি ভাবিও না। আমিও কি ঘর সংসার ফেলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাবছি? তুমি ভাল জিনিষটি আনলে তৃপ্তির সঙ্গে খাই না? ভাল কাপড় পরি না? তবে কিনা দশজনের জন্য যতটা সাধ্য করতে হবে। আগের মত শুধু নিজেদের নিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না।

ঃ আমিও তো তাই বলছি। আমি কি নামের কাঙাল, না নেতা হবার সখ আছে আমার? গা বাঁচিয়ে না থেকে যতটা পারি দশজনের লড়ায়ে এগিয়ে যাব,—তাতেই দশজন আপন ভাববে। সুমথেরা ভুল বুঝে সব গণ্ডগোল করে

দেবে টের পেয়েছিলাম বলেই না এগিয়েছিলাম? অতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হবে বলে? আগে অনায়াসে এড়িয়ে যেতাম—আজকাল চেষ্টা করেও পারব না। রাতে ঘুম হবে না।

সাধনা জোর দিয়ে বলে, তা হলে তোমার আমার মতের অমিলটা হচ্ছে কোথায়?

রাখালও সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে তাই নিয়ে।

সাধনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, বাস্তব জগৎ বদলে যাচ্ছে, আমাদের জীবনটা বদলাচ্ছে, তুমি আমি ত্'জনেও বদলাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি এ পরিবর্তনটার সঙ্গে অন্য সব কিছুর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলবার, বাস্তব যতটা বদলেছে, আমি যতটা বদলেছি তার সঙ্গে। যে রেটে বদলেছি তার সঙ্গেও। যেন বাড়াবাড়ি করে না বসি, যেন না ভাবি যে সব কিছু বদলে নতুন হয়ে গেছে বা ত্'চারদিনের মধ্যে হল বলে, যেন না ভাবি যে আমিও আর সেই রাখাল নেই—একেবারে অন্য একটা মানুষ হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি গা ছেড়ে দিয়েছ, ধরে নিয়েছ যে তুমিও আর সে সাধনা নেই, তোমার জীবনটাও একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটা পরিবর্তন সত্যি ঘটেছে, তুমি সেটাকে কল্পনায় বাড়িয়ে নিয়েছ হাজার গুণ।

একটু ইতস্ততঃ করে রাখাল যোগ দেয়, রাঁধছ বাড়ছ ছেলে মানুষ করছ আমার সেবা করছ, কিন্তু ভাবছ যে তোমার

আমার যে সম্পর্কটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গিয়ে একেবারে নতুন রকম একটা সম্পর্ক হয়েছে। নিজেকে তুমি আমার স্ত্রী ভাবছ না, আমাকে তোমার স্বামী ভাবছ না। মানুষ হিসাবে আমি তোমার অধিকার মানছি না, শুধু অন্যায় আর অবিচার করছি। আমি তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই—সেটা আমার ভীষণ অপরাধ! তোমায় আগে মানুষ ভাবতে হবে—তারপর তোমায় স্ত্রী ভাবা চলবে। আমি যেন তোমায় মানুষ ভাবি না—তোমায় গরু ছাগল ভেবে এতদিন তোমায় সঙ্গে ঘর সংসার করেছি।

সাধনা চুপ করে থাকে।

সে আরও শুনতে চায় বুঝতে পেরে রাখাল বলে, আমি তোমার মালিক, তুমি আমার সম্পত্তি এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? আমি কি এটা জানি না? আমি কি কালা যে যারা এই সত্যটা আবিষ্কার করে পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন, আমি তাদের কথা শুনতে পাব না? আমি কি নতুন মার্কিনী দর্শন প্রচারের দালাল যে এ সত্যটা অস্বীকার করব? আমি রোজগার করে তোমায় খাওয়াই পরাই, আমার ভাড়া করা ঘরে থাকতে দিই,—আমি তোমার মালিক বৈকি! খোকনকে খাঁটি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা গরু কিনে পুষলে আমি তারও মালিক হতাম। তাই বলে আমি কি তোমাকে আর গরুটাকে সমান করে দিতাম? আমার সম্পত্তি হলেও তোমাকে মানুষ ভাবতাম না? মানুষ বলেই তোমায় আমি বিয়ে করেছি, তোমার স্বামী বা মালিক হয়েছি।

রাখাল একটু থামে। সাধনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে দেখেও তার সংশয় জাগে যে সে তার কথার মর্ম বুঝবে কি না! তার নিজের সম্পত্তি, নিজের স্ত্রী—শাস্ত্র এবং আইন যাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করার অধিকার তাকে দিয়েছে—অথচ প্রায় তিন সপ্তাহ সে তাকে স্পর্শ করে নি! তাকে মানুষ ভাবে বলেই যে তার এই প্রাণান্তকর সংযম—এটুকু কি মাথায় ঢুকবে সাধনার?

এ যে তার রাগ অভিমান নয়, এতে যে তার বাহাদুরী নেই, সত্যই তাকে মানুষ মনে করে বলে তাকে বাধ্য হয়ে এ সংযম পালন করতে হচ্ছে, এই সহজ সরল কথাটা?

সাধারণ কলহ বিবাদ হলে আলাদা কথা ছিল। এখনকার অচল অবস্থায় সাধনাকে অপমান করার সাহস তার নেই! সে মানুষ বলেই নেই!

কোনদিক দিয়ে কি ভাবে তার প্রতিক্রিয়া আসবে সে জানে না। কিন্তু সাধনা মানুষ বলেই প্রতিক্রিয়াটা যে সাংঘাতিক হবে এটুকু জানে।

ধীরে ধীরে সে বলে, মনুষ্যত্বের দাবী নিয়ে সেন্টিমেণ্টাল হলে, ঝোঁকের মাথায় যন্ত্রের মত বিচার করলে, ফলটা মারাত্মক হয়। আসল কথাটাই গুলিয়ে যায়। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এটা মানুষেরি কীর্তি,—একদল মানুষের। এই দলের সঙ্গে বাকী মানুষের একটানা বিবাদ। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ বিগ্রহ বিক্ষোভ বিদ্রোহ সব কিছুর গোড়ায় ওই

সংঘাত। সোভিয়েটে চীনে বিপ্লব ঘটেছে এই কারণে—পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষেরা ক্রমে ক্রমে জয়ী হচ্ছে। এসব মোটামুটি তুমিও জানো আমিও জানি। এখন কথাটা হল এই, তুমি আমি চাইলেই মানুষের সব অধিকার পেয়ে যাব না। আমাদের ক্ষোভ আছে, দাবী আছে, লড়াই চলছে নানা ভাবে —এ একটা প্রক্রিয়া। ক্ষোভ আছে—কিন্তু বাস্তবকে ভুলে শুধু ক্ষোভটা ফেনিয়ে পাগল হলে তো চলবে না আমাদের। আমাদের বাঁচতেও হবে—যতই বঞ্চিত হই আর অপমান সই, জীবনটা আমাদের ফেলনা নয়। এটুকু বুঝে, লড়াই চলছে জেনে, ধৈর্য্য আমাদের ধরতেই হবে, বাস্তবকে মানতেই হবে। তা না হলে, হতাশা আসবে, বৈরাগ্য জাগবে, মন বিগড়ে যাবে, জ্বালাটা অসহ্য হয়ে খুন করার কিম্বা আত্মহত্যার ঝোঁক আসবে।

ঃ আমার কি হয়েছে ?

ঃ তোমার মন বিগড়ে গেছে, জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি শুধু ভাবছ স্ত্রী হওয়ার জন্য তোমার জীবনে কত অপমান পরাধীনতা অসম্পূর্ণতা। জ্বালাটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে তুমি একটা অবাস্তব অসম্ভব জীবন চাইছ—এ জীবনটা ভাল লাগছে না। জীবনটা মায়া, জগৎটা মায়া, সব কিছু বাজে, ক্রমাগত এসব ভাবতে ভাবতে যেমন বৈরাগ্যের বিকার আসে, চোখ বুজে একটা আধ্যাত্মিক জগতে বাস করতে সাধ হয়—তোমারও তাই হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে আড়ি করলে এই বিপদ হয়। আমি যে চাকরী করতাম—

কতগুলি অন্যায় অবিচার অপমান মেনে নিয়েই করতাম। আজ ব্যবসা করি বলেই কি আমি স্বাধীন হয়ে গেছি? আরও দশজনের মত মানুষ হিসাবে অনেক অপমান সইতে হয়। আমার কি জ্বালা ছিল না, এখন জ্বালা বোধ করি না? কিন্তু অনেক অন্যায় অবিচার সকীর্ণতা ব্যর্থতা আছে বলে নিজের জীবনটা খারিজ করি নি। প্রতিকার চেয়ে লড়াই করব, বাস্তবকে বদলে দেব—কিন্তু প্রাণের জ্বালায় বেঁচে থাকার ওপরেই বিতৃষ্ণা আনব কেন? তাহলে তো সব ফুরিয়ে যাবে। নিজের জীবনকে ভাল না বাসলে কিসের জন্য আমি লড়াই করব? আমার লড়াই তা হলে একটা ফাঁকা আদর্শের জন্য লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে!

ঃ যিনি সব কিছু ছেড়ে সারা জীবন শুধু লড়াই করছেন, শুধু আন্দোলন নিয়ে আছেন, তার কি ফাঁকা আদর্শের লড়াই?

ঃ নিশ্চয় না। তিনিও নিজের জীবনকে ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর ধাতটা বিশেষ রকমের বলে সৈনিকের জীবনটাই তার ভাল লাগে। নিজের জীবনটা যদি কেউ তুচ্ছ ভাবে, জীবনটা বিস্বাদ লাগে—দশজনের জন্য সে লড়াই করতে যায় না, বনে গিয়ে তপস্যা করে।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

ঃ আমি যে সভা সমিতিতে যাব, কিছু কিছু আন্দোলনে যোগ দেব ভাবছি—

ঃ তুমি মুক্তি চাইছ, একটু বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা চাইছ।

মরতে হয় ওর কাছে থেকেই মরব ভাড়ার টাকাটা বাকী রয়ে গেল—

হাসিটুকু মিলিয়ে যায় আশার।

ঃ জীবনে আর কারো সঙ্গে ভাব করব না। আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তোমার সঙ্গে ভাব করে তোমাদের ঠকিয়ে পালাচ্ছি, ঠকাবার জন্যই যেন ভাব করেছিলাম।

ঃ তোমার কি দোষ?

ঃ দোষ বৈকি। অনেক আগেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল। আমি কি ওর সঙ্গে পালাতাম ভেবেছ? কি করব, দায়ে ঠেকেছি। অনেক পাপ করে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি।

বাড়ী ফিরে সব শুনে রাখাল রেগে টং হয়ে বলে, আমার এতগুলি টাকা মেরে দিলে!

ঃ একলা তোমার নয়। অনেকের মেরেছে।

ঃ এসব মানুষকে ধরে চাবকানো উচিত!

বাসন্তী বলে, আহা বেচারা! কি করবে? যা দিন-কাল। ভদ্রঘরের ছেলে, নরম ধাত নিয়ে গড়ে উঠেছে। ঠেলায় পড়লে কি সামলাতে পারে? জিনিষপত্রের দামে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত। মাইনেতে কুলিয়ে গেলে কি বেচারা ধার সুরু করত, এভাবে ডুবত?

রাখাল সঞ্জীবকেই চাবকাতে চেয়েছিল। বাসন্তী তাকে দোষী করতে রাজী নয়!

সাধনা বলে, ধারের জন্য কিন্তু চাকরীটা যায় নি। আপিসের কর্তার সঙ্গে তর্ক করেছিল।

বাসন্তী বলে, ওমা! এত তেজও ছিল মানুষটার? তবেই ছাখো, মানুষ কি আর ছাঁচে গড়া হয়! একটা মানুষের মধ্যে কত রকমের ধাত মেশাল থাকে। এদিকে বেহায়ার মত ধার করে, অন্যদিকে তেজ দেখাতে গিয়ে চাকরী খোয়ায়!

আনমনে কি যেন ভাবে বাসন্তী।

সাধনা বলে, খালি খালি লাগছে বাড়ীটা।

বাসন্তী বলে, আমি আসব। বাড়ীতে হাট বসিয়েছে, বাড়ী খুঁজতে বলে দিয়েছি—আর খুঁজতে হবে না। ভাড়াও কম লাগবে।

ঃ ওই একখানা ঘরে হবে? মালপত্র আঁটবে তোর?

আঁটালেই আঁটবে। গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি হবে!

কদিনের অসুখে শোভার দাদার বৌ মারা যায়। বাঁচানো যেত, তবু মারা যায়।

চোখে জল আর মুখে রেহাই পাবার নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে শোভা এসে ধরা গলায় বলে, বৌদিই শেষে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

শোভা চোখ মোছে। আবার চোখে জল আসে। হাসবে বলে কাঁদে।

ঃ এবার একটা লোক রাখতেই হবে—তার বদলে আমি খাটব। এবার জোর গলায় বলতে পারব, বিয়ে ভেঙে দাও।

সাধনা চুপ করে থাকে।

শোভা বলে, আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছিলাম সাধনাদি। আপনারা তো কাজটাজ জুটিয়ে দিলেন না, আমি নিজেই জুটিয়েছিলাম।

: কি কাজ?

: রাঁধুনীর কাজ। আর কি কাজ জোটাব বলুন? আর কি শিখেছি রান্নাকরা বাসন মাজা ছাড়া? ও বাবা, রাঁধুনীর কাজ জোটানোও কি কঠিন ব্যাপার! কেউ আমাকে রাখতে চায় না! বিনয়বাবুর রাঁধুনী পালিয়েছে, আমি গিয়ে ধরে পড়লাম আমাকে রাখতেই হবে। বিনয়বাবু স্থহাসিনীদি দুজনে কিছুতেই রাজী হল না। আমি যত জোর করি, ওরা তত বলে, না বাবা, তোমায় রাখলে তোমার বাপদাদা গোলমাল করবে। প্রভাতবাবুর বামুনটা দেশে যাবে শুনে আমি গিয়ে ধরে পড়লাম, ওরাও কিছুতে রাজী হয় না। আমার বাপ-দাদা হাঙ্গামা করবে! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে জন্মানো কি ঝকমারি ভাবুন তো? শেষকালে প্রভাতবাবুর বন্ধু বামাচরণবাবু বললেন, পাড়ায় এত কাছে রাঁধুনীর কাজ নেওয়া তো উচিত নয়, বাপ-ভায়ের একটা সম্মান আছে তো? দূরে একবাড়ীতে আমায় কাজ জুটিয়ে দেবেন। ভদ্রলোক আবার একটা কবিতার বই লিখেছেন।

সাধনা গম্ভীর হয়ে বলে, বৌদি মরে গিয়ে সত্যি তোমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। বুড়োর হাত থেকে শুধু নয়, আরেকটা সর্ব্বনাশের হাত থেকে। বামাচরণ তোমায় রাঁধুনির কাজ দিত বিশ্বাস করলে তুমি?

শোভাও গম্ভীর হয়ে বলে, না দিলে না দিত। যে কাজ দিত তাই করতাম।

: তবু বাড়ীতে বলতে না বিয়েতে তোমার মত নেই?

: আপনি বুঝছেন না। কোন মুখে বলতাম? ওরা আমাকে খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্পষ্ট কথা। ঝি রাঁধুনী হিসাবেও পুষতে পারবে না—ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজত, তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে ঠিক হবার পর বাড়ীতে আমায় কোন কাজ করতে দিত না। রাঁধতে গেলে বাসন মাজতে গেলে বৌদি বলত, থাক্ থাক্, দু'দিন বাদে আমাকেই তো সব করতে হবে। মাও সায় দিত বৌদির কথায়। এবার উপায় নেই, লোক রাখতেই হবে। বৌদি মারা যাবার ঠিক দু'দিন পরে দাদা সুর পাল্টে মাকে বলেছে, বড্ড বুড়ো, শোভাকে ওর হাতে দিতে আমায় মন সরছে না। ছেলে মেয়ে রাখছি রাঁধছি বাড়ছি—আমাকে ছাড়া তো এখন চলবে না। নিজেরাই এবার বিয়ে ভেঙ্গে দেবে, আমার কিছু বলারও দরকার হবে না।

শোভা একটু হেসে খোঁচা দিয়ে বলে, আপনি বুঝবেন না সাধনাদি। রাখালবাবু বেশ রোজগার করছেন, স্বামীর আদরে একটি বাচ্চা নিয়ে সুখে আছেন—আমাদের ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

কথা হচ্ছিল রান্নাঘরে। রাখাল দাড়ি কামিয়ে তেল মাখতে এসে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শুনছিল।

এবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে বলে, তুমিও কিন্তু ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থাটা ঠিক জানো না শোভা। তুমি শুধু তোমাদের একটা ঘর দেখেছ। স্বামী বেশ রোজগার করে আনলেও ভদ্রঘরে সুখশান্তি থাকছে না!

আগে হলে সাধনা চটে যেত। রাখালের আসল জ্বালাটা টের পেয়েছে বলে আজ সে একটু বিরক্তও হয় না।

শোভা চটপট জবাব দেয়, কি করে থাকবে? দশটা ভদ্রলোকের ঘরে সুখশান্তি থাকবে না—একটা ঘরে শুধু খানিকটা রোজগার হচ্ছে বলে কখনো তা তাকে?

রাখাল একটু ভড়কে যায়।

সরষের তেলের শিশিটার দিকে চেয়ে দেখতে পায়, শুধু তার গায়ে মাখার মতই একটু তেল অবশিষ্ট আছে। সে পাঁচ ছটাক করে তেল আনে—একবারে বেশী তেল আনলে সাধনা নাকি বেশী তেল খরচ করে!

তার বেশ রোজগারের এটাই তো বেশ একটা নমুনা!

কিন্তু হার রাখাল মানবে না কিছুতেই। অন্ততঃ তর্কে তার জেতা চাই, কথায় জেতা চাই।

সে বলে, কিন্তু শোভা, তোমার দাদা তো আবার বিয়ে করবে। বাড়ীর চাকরী তখন তো থাকবে না তোমার?

ঃ দাদা আবার বিয়ে করবে? আগে চাকরে লোক বৌ মরতে মরতে আবার বিয়ে করত। সেদিন আছে আজকে? বৌদির জন্য কাঁদতে কাঁদতে দাদা একথাও ভাবছে না যে বাঁচা গেছে, একটা বোঝা কমেছে, রেহাই পেয়েছি?

আবার একটা বৌ এনে বোঝা বাড়াবে দাদা? আপনারা শুধু আগের দিনের হিসেব কষছেন, ব্যাপার কিছু বুঝছেন না।

সাধনা ও রাখাল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

আগের দিনের হিসাবের জের টানছে তারা!

শুধুই কি পরের বেলা? নিজেদের বেলা নয়?

রাখাল তবু গোঁয়ারের মত গায়ের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে হাল্কা তামাসার সুরে বলে, আমায় বিয়ে করবে শোভা?

শোভা বলে, এক্ষুনি। সাধনাদির সতীন হব, সে তো আমার ভাগ্যি!

প্রভাতের কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কবে কারখানায় কাজ সুরু হবে, কবে দুর্গা বিষ্ণুরা ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকে বলে মনে হয় খুবই যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে শেডটা।

বাসন্তী আসবে বলেও এ বাড়ীতে উঠে আসে নি। বলেছে, থাকগে' ভাই। এইটুকু ঘরে ওঁর অসুবিধা হবে সত্যি!

আসলে মায়া কাটাবাব মানুষ তো নয় বাসন্তী। উড়ে এসে যারা তার ঘরবাড়ী দখল করেছে ভাড়াটে হয়ে উড়ে এসে, তারাই তাকে বেঁধেছে নতুন মায়ায়। একপাল ছেলে মেয়ে সমেত চরণ দাসের পরিবারটি বাড়ীতে ভিড় করায় তার দম

আটকে এলেও ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বাসন্তীর।

তাড়াতাড়ি উঠে গেলে অন্য কথা ছিল। এক বাড়ীতে মানুষ বাস করলে তাদের বেশীদিন এড়িয়ে চলা একপাল ছেলে মেয়ে হৈ চৈ করে বলে খারাপ লাগা কি আর বাসন্তীর পক্ষে সম্ভব!

নিরীহ গোবেচারী রাধাকে হাসি মুখে চব্বিশ ঘণ্টা সংসার নিয়ে ব্রিব্রত হয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু গরম গরম মমতা বোধ করে বাসন্তী, নীচের তালায় গিয়ে তার সংসার করা দেখতে দেখতে তাকে মায়া করতে তার ক্রমেই যেন বেশী বেশী ভাল লাগে!

তার মেয়েটাকে প্রায় বেদখল করে ফেলেছে রাধার বড় তিনটি ছেলে মেয়ে। তাদের বাচ্চা ভাইটি বড় রোগা, খেলা ধুলা করে না, হাসে না, আদর সইতে পারে না। বাসন্তীর নাদুস নুদুস মেয়েটাকে ওরা তাই কাড়াকাড়ি করে কোলে নেয়, আদর করে, খেলা দেয়।

আর রাধার রোগা বাচ্চাটার বড় বড় চোখের করুণ চাউনি দেখে এমন মায়া হয় বাসন্তীর যে দিনে দশ বার তাকে কোলে না নিয়ে সে পারে না!

কাজেই বাড়ী বদলের কথাটা এখনো মুখে বললেও কাজে আর সেটা হয়ে ওঠে না।

রাখাল বলে, ওর বাপের বাড়ীতে নিশ্চয় অনেক লোক?

সাধনা বলে, মস্ত সংসার।

: বিয়ের পর শুধু একলাটি থাকা অভ্যাস। ভাড়াটের ভিড় আসতে প্রথমটা একটু খারাপ লেগেছিল, এখন আবার ভাল লাগছে।

: তুমি দেখছি মনস্তত্ত্বে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছ!

রাখাল চেষ্টা করে একটু হাসে।

সাধনাও হাসে।

সিদ্ধান্ত তাদের বজায় আছে। রাখাল মন ঠিক করে ফেলেছে যে আর নয় এবার তারা ভিন্ন বাস করবে। সাধনাও সেটা মেনে নিয়েছে শান্তভাবেই।

সেজন্য দু'জনেই তারা পরস্পরকে কি দিলাম আর কি পেলাম তার হিসাব, বিরোধ আর তিক্ততার হিসাব এসব নিয়ে মাথা ঘামানো স্থগিত রেখেছে।

যে কদিন একসাথে আছে ঝগড়া করে লাভ কি?

সব চাওয়া পাওয়া কলহ বিবাদের চরম মীমাংসা তো হয়েই গেছে, আর মিছে কেন কামড়াকামড়ি করা?

স্বামীস্ত্রীর মত থাকলেও তারা যেন আর স্বামীস্ত্রী নেই। দু'টি বন্ধু কিছুদিন একসাথে বাস করছে, যথাসময়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে চলে যাবে। প্রত্যাশা নেই, রোমাঞ্চ নেই, উন্মাদনা নেই, ভাবের আকাশের ঝড় থেমে গেছে।

নতুন ভাড়াটে এসেছে আশাদের ঘরে।

চেনা ভাড়াটে। সুমতী আর তার স্বামী অশোক।

সুমতীর বিয়ে হল হঠাৎ। বিয়েটা অবশ্য তাদের স্থির হয়ে ছিল অনেক কাল আগে থেকেই। অশোক মেসে থেকে

চাকরী খুঁজছিল বহুদিন, একটা চাকরী পেয়ে যাওয়ায় সুমতীকে বিয়ে করেছে।

তার আপনজনেরা থাকে পশ্চিমে। বিয়ে উপলক্ষে তারা এসে আবার ফিরে গেছে। সুমতীকে নিয়ে অশোক নীড় বেঁধেছে আশাদের ঘরে।

গড়া নীড় ভেঙ্গে পড়ায় এ ঘর থেকে পালিয়ে গেছে সঞ্জীব আর আশা, নতুন চাকরী নিয়ে সুমতী আর অশোক এসে উঠেছে সেই ঘরে।

সুমতী বলে, আমিও একটা চাকরী পেয়ে গেলাম, নইলে কি আর একজনের সামান্য মাইনের ভরসায় আমরা বিয়ে করতাম? দু'বছর অপেক্ষা করে আছি, আরও দু'এক বছর অপেক্ষা করতাম।

বলে, এখনও কিরকম সব পচা ব্যবস্থা চালু আছে দেখুন। চাকরী পেলাম বলেই কি বিয়ে করলাম? বিয়ে করলাম বলেই আবার চাকরীটা পেলাম! ম্যারেড মেয়ে চাই—বিয়ে না হলে চাকরীটা পেতাম না! সামান্য বেতন, একজনেরি ভাল চলবে না, সেজন্য আবার ম্যারেড হওয়া চাই!

নব-দম্পতি। ভালবাসার বিয়ে—দু'বছর ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পর!

সাধনা ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না জানি করবে দু'জনে। ভালবাসার কত বিচিত্র লীলাখেলা দিয়ে রোমাঞ্চকর করে তুলবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মিলনকে!

রাখালকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবার দিনটির প্রতীক্ষা করতে করতে তার কি সহ্য হবে চোখের সামনে ওদের উদ্দাম উচ্ছল ভালবাসা, সরস মধুর মিলন, পৃথিবীতে স্বপ্নজগৎ রচনা করা ?

ত্ব'জনের কাণ্ড দেখে সে থ' বনে যায়। সে যেমন ভেবে ছিল সে রকম কিছুই ত্ব'জনকে করতে না দেখে !

হাতে যেন স্বর্গ তারা পায় নি, সুখে আনন্দে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দিশেহারা হবার মত কিছুই যেন ঘটে নি !

মিলনটা যেন তাদের একটা সাধারণ ঘটনা।

ত্ব'জনের আনন্দ টের পাওয়া যায় ! সুমতীর মুখে কেমন একটু রুক্ষতার ছাপ ছিল, সেটা উপে গিয়ে নতুন লাবণ্যের সঞ্চারটা স্পষ্টই চোখে পড়ে।

ত্ব'জনে সুখী হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ত্ব'জনের হাসি গল্প মেলামেশা ঘরকন্না সবই যেন শান্ত আর সংযত। হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্দামতা নেই।

একদিন রাত্রে ওরা ত্বয়ার বন্ধ করলে সাধনা চেষ্টা করেও নিজেকে ঠেকাতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপি চুপি ত্বয়ারের ফুটোয় চোখ পেতে উঁকি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে মনে হয়, সে যেন নতুন রকম ম্যাজিক দেখে এল।

বিয়ের এতকাল পরে সংঘাতে সংঘাতে সম্পর্ক একরকম ছিঁড়ে যাবার পর, ভিন্ন হয়ে শান্তিতে থাকা ঠিক করার পর, তার আর রাখালের সম্পর্ক যেমন দাঁড়িয়েছে, রুদ্ধ ঘরের

গোপনতায় ওই নব বিবাহিত মানুষ দুটির সম্পর্কও প্রায় সেই রকম—উচ্ছ্বাস নেই, গদগদ ভাব নেই।

তফাৎ শুধু এই যে তাদের ঝিমানো নিস্তেজ ভাবের বদলে ওরা অনেক বেশী সতেজ, হাসিখুসী।

•

রাখালকে কয়েকদিন খুব চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

বাসন্তীর কাছেই কারণটা জানতে পারায় সাধনা তাকে আর কোন প্রশ্ন করে নি।

কোথা থেকে সংগ্রহ করে রাখাল নাকি আরও দশহাজার টাকা ব্যবসায়ে লাগাবে।

তাদের দু'জনের বর্ত্তমান দোকানে নয়, নতুন একটা ব্যবসায়ে।

দশ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ব্যবসা সুরু করবে রাখাল, কোথায় টাকা পাবে, কিসের ব্যবসা করবে কোন কথাই সে সাধনাকে জানায় নি।

আগে হলে সাধনা ক্ষেপে যেত, এখন নিশ্বাস ফেলে সে শুধু ভাবে, না জানাবারই কথা! তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কি?

নাঃ, আর দেরী করা নয়। এবার সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে দাদার কাছে চলে যাবে।

কিন্তু পরদিন রাখাল নিজে থেকেই তাকে সব জানায়। বলে, কদিন ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। তোমার কি মনে হয় বল তো?

সতীশের অসুখটা চাপা পড়েছে কিন্তু দেহের অনেক কালের অনেকগুলি চাপা রোগ তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। আরও কিছুকাল বাঁচবে, কিন্তু বিছানাতেই কাটবে তার বেশীর ভাগ সময়।

বিশুর মা অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছে। কিছু আয়ের ব্যবস্থা না হলে এভাবে আর কতদিন চলবে? পুঁজি কমছে—কিছুকাল পরে পুঁজি খাটিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করার উপায়টাও হাতের বাইরে চলে যাবে।

একটা ব্যবস্থা রাখালকে করে দিতেই হবে এবার। ছেলের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে রাখাল তার। রাখাল নিজে কি অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় সামলে উঠেছে বিশুর মা তা জানে, রাখাল তার জন্য একটা উপায় করে দিক।

ঃ গয়না বেচে হাজার দশেক টাকা দেবেন। আমি ভাবছি দায়িত্বটা নেওয়া যাক। নতুন ব্যবসায়ে খাটানো যাক টাকাটা। আমিও ওর কাছে ঋণী—

ঃ ঋণী—?

ঃ তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। রাজীবের সঙ্গে দোকান করার টাকাটা বিশুর মার কাছেই পেয়েছিলাম।

ঃ ও!

ঃ সে উপকার ভোলা যায় না। প্রাণ দিয়ে খেটে নতুন ব্যবসাটা যদি দাঁড় করাতে পারি—আমার খাটুনির দামে ওই ঋণটাও শোধ হবে, পরে লাভের অংশও পাব।

: কি ব্যবসা করবে ?

: ভাবছি, যে সব ব্যবসার কিছুই জানি না তার কোন একটার মধ্যে না গিয়ে এতদিন যে কারবারের খুঁটিনাটি জানলাম বুঝলাম সেটাই করব। দোকান আছে থাক, ওই সঙ্গে বিড়ি বানাবার ছোট একটা ফ্যাক্টরী করব। শুধু ব্যবসা নয়, এর আর একটা দিকও আছে। কতগুলি লোককে খেটে খাবার সুযোগ দিতে পারব।

: না চললে, টাকাটা নষ্ট হলে, তোমার দায়িত্ব কি ?

: এমনি কোন দায়িত্বই থাকবে না। ইচ্ছা করলে টাকাটা আমি মেরেও দিতে পারব। আমাকে এতটা বিশ্বাস করছেন, এ সত্যি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

ঃ আশ্চর্য্য ব্যাপার আবার কি ? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না সংসারে, চেনা জানা মানুষকে ? এতদিন দেখছেন তোমায়, বুঝতে পেরেছেন বিশ্বাস করতে হলে তোমাকেই করা যায়। ওর বোন তো তোমাকে প্রায় দেবতার মত ভক্তি করে।

শান্তভাবে সহজভাবে তারা কথা বলে।

: কে বলতে পারে, ছোটখাট বিড়ি ফ্যাক্টরী থেকেই হয় তো বিশুর মা আর আমাদের কপাল ফিরে যাবে। হাজার বিড়িতে কিছু বেশী মজুরিও হয় তো দিতে পারব।

এ কথাটাও এমনভাবে বলে রাখাল যে বেশ বোঝা যায় আশা ও আবেগ উদ্দীপনা জাগিয়ে সাধনার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সত্যই ত্যাগ করেছে,

সাধনাকে বিশ্বাস করানোর প্রয়োজন যেন তার সত্যই ফুরিয়ে গেছে।

ইচ্ছা করলে সাধনা সোজাসুজি প্রতিবাদও করতে পারে। বলতে পারে, ছাই পারবে, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। ওভাবে কোন কথা না বললেও সাধনা তাকে সাবধান করে দেয়, বলে, রাজীববাবুর পরামর্শ নিও। উনি এ লাইনে অনেককাল আছেন!

নিজে উদ্যোগী হয়ে তাড়াতাড়ি দাদার কাছে যাবার ব্যবস্থা করার কথাটা এরপর সাধনা ভুলে যায়।

প্রভাতের কারখানার শেডটা উঠছিল ধীরে ধীরে, হঠাৎ একদিন খুব তাড়াতাড়ি কাজ এগোচ্ছে দেখা যায়।

চশমা পরা প্রৌঢ় বয়সী মোটাসোটা অচেনা এক ভদ্রলোককে মোটরে চেপে প্রতিদিন কাজ পরিদর্শন করতে আসতে দেখা যায়।

বিড়ির কারখানা আরম্ভ করা নিয়ে রাখাল খুব ব্যস্ত ছিল, তবু পরদিন সে ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তার মোটর এলে কথা বলতে যায়।

ফিরে আসে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে।

বলে, প্রভাত সত্যিই আমাদের ভাঁওতা দিয়েছে।

ঃ কি ব্যাপার?

ঃ কারখানা করবার কোন মতলব প্রভাতের ছিল না। সব এই ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছে। ওদের উঠিয়ে না দিলে

জমি বিক্রী হয় না, তাই ওসব ভাঁওতা দিয়েছিল। ফ্যাক্টরী করবে, সকলকে কাজ দেবে, থাকবার ঘর করে দেবে,—সব বাজে কথা। বামাচরণ মাঝখানে ছিল, দু'জনের কাছে কমিশন বাগিয়েছে।

রাগটা প্রভাতের উপর, কিন্তু সে তো আর সামনে নেই, সাধনার দিকে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকে যে মনে হয় এখুনি সাধনাকেই মেরে বসবে!

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমার কথাই ফলল। আমায় বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিল!

সাধনা শান্তভাবে বলে, তোমার একার দোষ নয়, আরও অনেকে তো ছিল। এঁকে সব কথা বললে না?

: বললাম বৈকি! ইনি বললেন, প্রভাত কি বলেছে না বলেছে তার দায়িত্ব ইনি নেবেন কেন? কারখানায় আনাড়ি লোক দিয়ে কি করবেন? তবে ছুটকো কাজের জন্য দরকার হলে দু'এক জনকে নিতে পারেন—সে তখন দেখা যাবে!

সাধনা ফোঁস করে ওঠে!

: ইস্, বললেই হল দেখা যাবে! প্রভাতবাবু নিজের হাতে লিখে দিয়েছে, জমি যে কিনবে ওই চুক্তিটাও তাকে মানতেই হবে। অত আইন বাঁচিয়ে বজ্জাতি করা চলবে না। এত গুলি লোকের কাছে কথা দিয়েছে সেটা ঢের বড় আইন।

সাধনা সত্যি রেগেছে। এতকাল রাগ দেখাত শুধু তারই উপর, তাই বুঝি রাখালের চোখে পড়ত না তার রাগের

ভঙ্গিটা কত সুন্দর। এক অন্যায় কারসাজির বিরুদ্ধে তাকে রাগতে দেখে রাখাল আজ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

সে হেরে গিয়েছে। প্রভাত বজ্জাতি করবে কি করবে না এই নিয়ে কি তীব্র মন কষাকষি হয়ে গেছে তাদের—। প্রকাশ্য সভায় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কলোনির লোকেদের পক্ষ নেওয়ায় সাধনাকে সে প্রায় শত্রু মনে করে বসেছিল।

সাধনার কথাই ফলেছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাধনার কাছে হেরে গিয়ে এতটুকু জ্বালা তো রাখাল বোধ করছে না। বরং কি ভাবে যেন জুড়িয়ে গেছে সাধনার উপর রাগ আর অভিমানের জের।

অন্যায়টা বড় হয়ে ওঠায় তাদের দু'জনেরি এবার অন্যায়টার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে জেনে তারা যেন সরে এসেছে কাছাকাছি, তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের সংঘাত।

সাধনা বলে, কালকেই একটা মিটিং ডাকতে হবে। এ ভদ্রলোককে জানিয়ে দিতে হবে জমি আর কারখানা কেনার সঙ্গে উনি প্রভাতবাবুর চুক্তিটাও কিনেছেন।

রাখাল বলে, নিশ্চয়। কলোনির ওদের সঙ্গে আগে কথা বলা দরকার।

: ঠিক বলেছ। ওরা প্রত্যাশা করে আছে, ব্যাপারটা ওদের জানাতে হবে। চলো না তুমি আমি এখুনি যাই?

আলু কুমড়োর তরকারী আর ডাল হয়েছে, এসে তোমায় বেগুন ভেজে দেব।

ঃ তাই চলো।

সাধনা শুধু একনজর তাকায় পরণের কাপড়টার দিকে, বদলায় না। শুধু চুলটা একবার আঁচড়ে নিয়ে স্যাণ্ডেলে পা গলায়।

বলে, পয়সা নিও, মাখন আনতে হবে। এমনি মাখন খাবে, পাতে খাবার সময় একটু একটু গালিয়ে ঘি করে দেব'খন।—এ আবার কি? একেবারে চমকে গেছি।

অনেকক্ষণ এভাবে রাখাল আচমকা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে নি, সাধনার তাই সত্যই চমক লেগে খানিকক্ষণ বুকটা ধড়াস্ ধড়াস করে।

পথে নেমে চলতে চলতে রাখাল বলে, সেদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়েছিলাম। আমার হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল।

ঃ আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক ধরতে পারিনি কিন্তু একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল কথাগুলি। ঠিক কথাই যেন বলছ কিন্তু কোন একটা হিসাবে যেন গোলমাল হচ্ছে।

ঃ আসল হিসাবেই গোল হয়েছিল। আমি যে বলেছিলাম স্বামীর স্বার্থ সম্পর্কে তুমি উদাসীন হয়ে গেছ, সাধারণ স্ত্রীর জীবনে তোমার বিতৃষ্ণা এসেছে—ওটা ভুল বলেছিলাম।

ঃ জীবনে আমার বিতৃষ্ণা আসে নি মোটেই! তবে তোমার সম্পর্কে মনটা বিড়ড়ে গেছে কিনা ঠিক জানি না। মিথ্যে বলব কেন, আগের মত ভাবতে পারি না তোমাকে। তুমি আদর করবে আর আমি অহ্লাদি খুকীর মত গলে যাব ভাবলেও গা ঘিন ঘিন করে!

ঃ আমারও করবে। আসলে আমিই মনে মনে চাইতাম আমরা আবার আগের মত হই, আগের জীবনটা ফিরে আসুক! তুমি বিগড়ে গিয়েছ, তোমার জন্য সেটা হচ্ছে না ভেবে তোমায় দোষী করেছিলাম। দোষ হয় তো তোমার আছে খানিকটা, কিছু বাড়াবাড়ি সত্যি করেছ—কিন্তু সেটা তোমার একার দোষ নয়। আমিও বুঝতে না পেরে বাড়াবাড়ি করেছি। তোমার পক্ষে যেমন হওয়া বা দেওয়া আর সম্ভব নয়, তাই দাবী করেছি! আসল কথা কি দাঁড়িয়েছে সেটাই হিসেব করিনি। আমাদের আগের জীবন আর ফিরে আসবে না। বাস্তব জগত যতটা পালটেছে আর আমরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে—স্বামী ভক্তি টক্তি অনেক কিছু।

রাখাল একটা বিড়ি ধরায়।—অন্য রকম ভাবলেও আমি আসলে কিন্তু ভুল করে তোমার কাছে একটু স্বামীভক্তিই চাইছিলাম।

রাখাল হাসে।—তুমি ওটা দিতে পারলে আমার চৈতন্য হত নিশ্চয়, দেখতাম আমার কাছেও মিথ্যা হয়ে গেছে

জিনিষটা, বিশ্রী লাগছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন রকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ-ভালবাসার মূল কথা যে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ এক প্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এসব ফাঁকি আর চলবে না।

বাসের জন্য বড় রাস্তার মোড়ে সুমতী আর অশোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। দু'জনে একসঙ্গেই চাকরী করতে বেরিয়েছে।

সাধনা বলে, ওদের কিছু বলো না এখন। আপিসে লেট হয়ে যাবে। ফিরে এসে তো শুনবেই সব।

মোড়টা পেরিয়ে জোর দিয়ে রাখাল বলে, আমি রোজগার করি তুমি ঘরে বসে খাও এজন্য কিছুটা ফাঁকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে—সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না। সেটা হবে অবাস্তব স্বপ্ন দেখা—নিজেদের ফাঁকি দেওয়া। তবু মোটামুটি ওটাই হবে আমাদের নতুন সম্পর্কের ভিত্তি। আর সব চেয়ে বড় কথা, এটা আমাদের ভাল লাগবে। মাসখানেক আমরা তো দিব্যি আছি।

: সত্যি।

: কত বিষয়ে আমাদের ভুল বোঝা রয়ে গেছে, ভিন্ন হব ভেবে মনমরা হয়ে আছি, কি রকম বিশ্রী বাধ' বাধ' ভাব রয়ে গেছে—তবু একটা মাস বেশ কাটল আমাদের। জঞ্জাল সাফ করে নিলে আমরা আরও ঢের বেশী সুখে দিন কাটাব—

ঝগড়া করতেও আবার মজা লাগবে মাঝে মাঝে ঝাল খাওয়ার মত।

সাধনা হাসে। বলে, খোকাকে বাসন্তীর কাছে রেখে এসেছি। কথা আমাদের সারাজীবনে ফুরোবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চল।

শেষ